স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

স্বামী বিবেকানন্দ

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 3
২. ধর্ম ও মোক্ষ 7
৩. স্বধর্ম বা জাতিধর্ম 12
৪. শরীর ও জাতিতত্ত্ব 18
৫. পোষাক ও ফ্যাশন 22
৬. পরিচ্ছন্নতা 25
৭. আহার ও পানীয় 29
৮. বেশভূষা 42
৯. রীতিনীতি 46
১০. পাশ্চাত্যে শক্তিপূজা 49
১১. ইওরোপের নবজন্ম 50
১২. পরিণামবাদ 59
১৩. সমাজের ক্রমবিকাশ 61
১৪. দেবতা ও অসুর 63
১৫. দুই জাতির সংঘাত 66

১৬. উভয় সভ্যতার তুলনা..... 6 9
১৭. পরিশিষ্ট *..... 7 3

১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

[স্বামীজীর এই মৌলিক রচনাটি প্রথমে ‘উদ্বোধন’ পত্রিকায় ২য় ও ৩য় বর্ষে ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়।]

সলিলবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, তন্মধ্যে অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত রত্নখচিত মেঘস্পর্শী মর্মরপ্রাসাদ; পার্শ্বে, সম্মুখে, পশ্চাতে ভগ্নমৃণ্ময়প্রাচীর জীর্ণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালকবালিকা; মধ্যে মধ্যে সমধর্মী সমশরীর গো-মহিষ-বলীবর্দ; চারিদিকে আবর্জনারাশি—এই আমাদের বর্তমান ভারত।

অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়ক্রোড়ে আবর্জনাস্তূপ, পট্টশাটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতির্হীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি—আমাদের জন্মভূমি।

বিসূচিকার বিভীষণ আক্রমণ, মহামারীর উৎসাদন, ম্যালেরিয়ার অস্থি-মজ্জা-চর্বণ, অনশন-অর্ধাশন-সহজভাব, মধ্যে মধ্যে মহাকালরূপ দুর্ভিক্ষের মহোৎসব, রোগশোকের কুরুক্ষেত্র, আশা-উদ্যম-আনন্দ-উৎসাহের কঙ্কাল-পরিপ্লুত মহাশ্মশান, তন্মধ্যে ধ্যানমগ্ন মোক্ষপরায়ণ যোগী—ইওরোপী পর্যটক এই দেখে।

ত্রিংশকোটি মানবপ্রায় জীব—বহুশতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত-প্রাণ, দাসসুলভ-পরিশ্রম-সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীতহীন, ভবিষ্যদ্বিহীন, ‘যেন তেন প্রকারেণ’ বর্তমান প্রাণধারণমাত্র-প্রত্যাশী, দাসোচিত ঈর্ষাপরায়ণ, স্বজনোন্নিত-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ-চাতুরী-প্রতারণা-সহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন, আশা-হীনের সমুচিত কদর্য বিভীষণ-কুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক-

মেরুদণ্ডহীন, পূতিগন্ধপূর্ণ-মাংসখণ্ডব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারতশরীরে পরিব্যাপ্ত–ইংরেজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি।

নববলমধুপানমত্ত হিতাহিতবোধহীন হিংস্রপশুপ্রায় ভয়ানক, স্ত্রীজিত, কামোন্মত্ত, আপাদমস্তক সুরাসিক্ত, আচারহীন, শৌচহীন, জড়বাদী, জড়-সহায়, ছলে-বলে-কৌশলে পরদেশ- পরধনাপহরণপরায়ণ, পরলোকে বিশ্বাসহীন, দেহাত্মবাদী, দেহপোষণৈকজীবন–ভারতবাসীর চক্ষে পাশ্চাত্য অসুর।

এই তো গেল উভয় পক্ষের বুদ্ধিহীন বহির্দৃষ্টি লোকের কথা। ইওরোপী বিদেশী সুশীতল সুপরিষ্কৃত সৌধশোভিত নগরাংশে বাস করেন, আমাদের 'নেটিভ' পাড়াগুলিকে নিজেদের দেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরের সঙ্গে তুলনা করেন। ভারতবাসীদের যা সংসর্গ তাঁদের হয়, তা কেবল একদলের লোক–যারা সাহেবের চাকরি করে। আর দুঃখ-দারিদ্র্য তো বাস্তবিক ভারতবর্ষের মত পৃথিবীর আর কোথাও নাই! ময়লা-আবর্জনা চারিদিকে তো পড়েই রয়েছে। ইওরোপী চক্ষে এ ময়লার, এ দাসবৃত্তির, এ নীচতার মধ্যে যে কিছু ভাল থাকা সম্ভব, তা বিশ্বাস হয় না।

আমরা দেখি–শৌচ করে না, আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছবিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই নাচ–এ জাতের মধ্যে কি ভাল রে বাপু!

দুই দৃষ্টিই বহির্দৃষ্টি, ভেতরের কথা বুঝতে পারে না। বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, 'ম্লেচ্ছ' বলি–ওরাও 'কালো দাস' বলে আমাদের ঘৃণা করে।

এ দুয়ের মধ্যে কিছু সত্য অবশ্যই আছে, কিন্তু দু-দলেই ভেতরের আসল জিনিষ দেখেনি।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাহিরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র–ভাষা মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে! এই ভাব জগতের কার্য করেছে–সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে-দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-

বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক। ইওরোপীয়দের তেমনি একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা না হলে সংসার চলবে না; তাই ওরা প্রবল। একেবারে নিঃশক্তি হলে কি মানুষ আর বাঁচে? জাতিটা ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র; একেবারে নির্বল নিষ্কর্মা হলে জাতটা কি বাঁচবে? হাজার বছরের নানা রকম হাঙ্গামায় জাতটা মলো না কেন? আমাদের রীতিনীতি যদি এত খারাপ, তো আমরা এতদিনে উৎসন্ন গেলাম না কেন? বিদেশী বিজেতাদের চেষ্টায় ত্রুটি কি হয়েছে? তবু সব হিঁদু মরে লোপাট হল কেন—অন্যান্য অসভ্য দেশে যা হয়েছে? ভারতের ক্ষেত্র জনমানবহীন হয়ে কেন গেল না, বিদেশীরা তখুনি তো এসে চাষ-বাস করত, যেমন আমেরিকায় অষ্ট্রেলিয়ায় আফ্রিকায় হয়েছে এবং হচ্ছে?

তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভাব, ওটা কল্পনা। ভারতেও বল আছে, মাল আছে—এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে, তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ—যারা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং 'আমরা নরপশু, তোমরা হে ইওরোপী লোক, আমাদের উদ্ধার কর' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে 'হাঁসেন হোঁসেন' করছ। ওহে বাপু, যীশুও আসেননি, যিহোবাও আসেননি, আসবেনও না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড় চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্নিও, সেলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত, চীন, জাপান সাইবেরিয়া পর্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন; ঐ যে মা কালী—উনি চীন, জাপান পর্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর-মা মেরী করে ক্রিশ্চানরা পূজা করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড-কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারেননি, ও কি এখন পাদ্রী-ফাদ্রীর কর্ম!! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু-

চারজনের জন্য দেশসুদ্ধ লোককে হাড়-জ্বালাতন হতে হবে বুঝি? চরে খাওগে না কেন? এত বড় দুনিয়াটা পড়ে তো রয়েছে। তা নয়। মুরদ কোথায়? ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর নিমকহারামী করবেন, যীশুর জয় গাইবেন—আ মরি!! ঐ যে সাহেবদের কাছে নাকি-কান্না ধর যে, 'আমরা অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব খারাপ,'এ কথা ঠিক হতে পারে—তোমরা অবশ্য সত্যবাদী; তবে ঐ 'আমরা'র ভেতর দেশসুদ্ধকে জড়াও কেন? ওটা কোন্ দিশি ভদ্রতা হে বাপু?

প্রথম বুঝতে হবে যে, এমন কোন গুণ নেই, যা কোন জাতিবিশেষের একাধিকার। তবে কোন ব্যক্তিতে যেমন, তেমনি কোন জাতিতে কোন কোন গুণের আধিক্য—প্রাধান্য।

২. ধর্ম ও মোক্ষ

আমাদের দেশে 'মোক্ষলাভেচ্ছার' প্রাধান্য, পাশ্চাত্যে 'ধর্মের' । আমরা চাই কি?–'মুক্তি'। ওরা চায় কি?–'ধর্ম'। ধর্ম-কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে।

ধর্ম কি?–যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।

মোক্ষ কি?–যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামী, পরলোকেরও তাই। এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তো এ-লোকও নয়, পরলোকও নয়, তবে সে দাসত্ব–লোহার শিকল আর সোনার শিকল। তারপর প্রকৃতির মধ্যে বলে বিনাশশীল সে-সুখ থাকবে না। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই। এইজন্য ঐ যে কথা শুনেছ, মুক্তপুরুষ ভারতেই আছে, অন্যত্র নেই, তা ঠিক। তবে পরে অন্যত্রও হবে। সে তো আনন্দের বিষয়। এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হল, খালি মোক্ষমার্গই প্রধান হল। তাই অগ্নিপুরাণে রূপকচ্ছলে বলেছে যে, গয়াসুর (বুদ্ধ)১সকলকে মোক্ষমার্গ দেখিয়ে জগৎ ধ্বংস করবার উপক্রম করেছিলেন, তাই দেবতারা এসে ছল করে তাঁকে চিরদিনের মত শান্ত করেছিলেন। ফল কথা, এই যে দেশের দুর্গতির কথা সকলের মুখে শুনছ, ওটা ঐ ধর্মের অভাব। যদি দেশসুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে, সে তো ভালই; কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে। নইলে খামকা দেশসুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল–না এদিক, না ওদিক। যখন বৌদ্ধরাজ্যে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে। বৌদ্ধ, ক্রিশ্চান, মুসলমান, জৈন–ওদের একটা ভ্রম যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল; জাতি-ব্যক্তি-প্রকৃতি-ভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা।

জোর করে এক করতে গেলে কি হবে? বৌদ্ধরা বললে, 'মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়াসুদ্ধ মুক্তি নেবে চল'। বলি, তা কখনও হয়? 'তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব কথায় বেশী আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম কর'—এ-কথা বলছেন হিঁদুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে! কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ!! হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, 'ধর্মের' চেয়ে 'মোক্ষ'টা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি! অহিংসা ঠিক, 'নির্বৈর' বড় কথা; কথা তো বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন—তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িনমায়ান্তং'২ ইত্যাদি। হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই—মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত-জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরক-ভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত। সত্য, সত্য, পরম সত্য—স্বধর্ম কর হে বাপু! অন্যায় কর না, অত্যাচার কর না, যথাসাধ্য পরোপকার কর। কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে। মহা উৎসাহে অর্থোপার্জন করে স্ত্রী-পরিবার দশজনকে প্রতিপালন—দশটা হিতকর কার্যানুষ্ঠান করতে হবে। এ না পারলে তো তুমি কিসের মানুষ? গৃহস্থই নও—আবার 'মোক্ষ' ! !

পূর্বে বলেছি যে, 'ধর্ম' হচ্ছে কার্যমূলক। ধার্মিকের লক্ষণ হচ্ছে সদা কার্যশীলতা। এমন কি, অনেক-মীমাংসকের মতে বেদে যে স্থলে কার্য করতে বলছে না, সে স্থানগুলি বেদই নয়—'আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাং'৩। 'ওঁকারধ্যানে সর্বার্থসিদ্ধি', 'হরিনামে সর্বপাপনাশ', 'শরণাগতের সর্বাপ্তি'—এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সাধুবাক্য অবশ্য সত্য; কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে, লাখো লোক ওঁকার জপে মরচে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' বলছে এবং পাচ্ছে—ঘোড়ার ডিম। তার মানে বুঝতে হবে যে,

কার জপ যথার্থ হয়, কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ, কে শরণ যথার্থ নিতে পারে–যার কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ যে 'ধার্মিক' ।

প্রত্যেক জীব শক্তিপ্রকাশের এক-একটি কেন্দ্র। পূর্বের কর্মফলে সে শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে, আমরা তাই নিয়ে জন্মেছি। যতক্ষণ সে শক্তি কার্যরূপে প্রকাশ না হচ্ছে, ততক্ষণ কে স্থির থাকবে বল? ততক্ষণ ভোগ কে ঘোচায় বল? তবে কুকর্মের চেয়ে সুকর্মটা ভাল নয়? পূজ্যপাদ শ্রীরামপ্রসাদ বলেছেন, 'ভাল মন্দ দুটো কথা, ভালটা তার করাই ভাল।'

এখন ভালটা কি? 'মুক্তিকামের ভাল' অন্যরূপ, 'ধর্মকামের ভাল' আর একপ্রকার। এই গীতাপ্রকাশক শ্রীভগবান্ এত করে বুঝিয়েছেন, এই মহাসত্যের উপর হিঁদুর স্বধর্ম, জাতিধর্ম ইত্যাদি। 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'–ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য মোক্ষকামের জন্য। আর 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি, 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব' ইত্যাদি ধর্মলাভের উপায় ভগবান্ দেখিয়েছেন! অবশ্য, কর্ম করতে গেলেই কিছু না কিছু পাপ আসবেই। এলই বা; উপোসের চেয়ে আধপেটা ভাল নয়? কিছু না করার চেয়ে, জড়ের চেয়ে ভাল-মন্দ-মিশ্র কর্ম করা ভাল নয়? গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেওয়ালে চুরি করে না; তবু তারা গরুই থাকে, আর দেওয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে, মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। সত্ত্বপ্রাধান্য-অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরমাধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভালমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে–এই সত্ত্বপ্রধান হয়েছে, কি তমঃপ্রধান হয়েছে, কি করে বুঝি বল? সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব-অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি, এ কথার জবাব দাও?–নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়। 'ফলেন পরিচীয়তে' । সত্ত্বপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়, কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্তি [শান্তভাব] মহাবীর্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মত হাত পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রধাণ ব্রাহ্মণ,

সর্বলোকপূজ্য; তাঁকে কি আর 'পূজা কর' বলে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে হয়? জগদম্বা তাঁর কপালফলকে নিজের হাতে লিখে দেন যে, এই মহাপুরুষকে সকলে পূজা কর, আর জগৎ অবনতমস্তকে শোনে। সেই মহাপুরুষকেই 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' ইত্যাদি। আর ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে, ঢোক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না—ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান্ এত করে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'; শেষ—'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'। ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশসুদ্ধ পড়ে কতই 'হরি' বলছি, ভগবান্‌কে ডাকছি, ভগবান্ শুনছেনই না আজ হাজার বৎসর। শুনবেই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না, তা ভগবান্। এখন উপায় হচ্ছে ঐ ভগবদ্বাক্য শোনা—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ'; 'তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব'।

এখন চলুক পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যের কথা। প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইওরোপীয়দের ঠাকুর যীশু উপদেশ করছেন যে, নির্বৈর হও, এক গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ কর্ম বন্ধ কর, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে বসে থাক, আমি এই আবার আসছি, দুনিয়াটা এই দু-চার দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কার্য কর, শত্রু নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর। কিন্তু 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হল; ওরা-ইওরোপীরা যীশুর কথাটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না। সদা মহা রজোগুণ, মহাকার্যশীল, মহা উৎসাহে দেশ-দেশান্তরের ভোগসুখ আকর্ষণ করে ভোগ করছে। আর আমরা কোণে বসে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে, দিনরাত মরণের ভাবনা ভাবছি, 'নলিনীদলগতজলমতিতরলং তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্'৪ গাচ্ছি; আর যমের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে। আর পোড়া যমও তাই বাগ পেয়েছে, দুনিয়ার রোগ আমাদের দেশে ঢুকছে। গীতার উপদেশ শুনলে কে? না ইওরোপী। আর যীশুখ্রীষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ করছে কে? না—কৃষ্ণের বংশধরেরা!! এ-কথাটা বুঝতে হবে। মোক্ষমার্গ তো প্রথম বেদই উপদেশ করেছেন। তারপর বুদ্ধই বল, আর যীশুই বল, সব ঐখান থেকেই তো যা

কিছু গ্রহণ। আচ্ছা, তাঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী–'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'–বেশ কথা, উত্তম কথা। তবে জোর করে দুনিয়াসুদ্ধকে ঐ মোক্ষ মার্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কেন? ঘষে মেজে রূপ, আর ধরে বেঁধে পিরীত কি হয়? যে মানুষটা মোক্ষ চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্য বুদ্ধ বা যীশু কি উপদেশ করেছেন বল–কিছুই নয়। 'হয় মোক্ষ পাবে বল, নয় তুমি উৎসন্ন যাও' এই দুই কথা! মোক্ষ ছাড়া যে কিছু চেষ্টা করবে, সে আটঘাট তোমার বন্ধ। তুমি যে এ দুনিয়াটা একটু ভোগ করবে, তার কোন রাস্তা নাই, বরং প্রতিবাদে বাধা। কেবল বৈদিক ধর্মে এই চতুর্বর্গ সাধনের উপায় আছে–ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ; যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্বনাশ!!! তারপর ভাগ্যফলে ইওরোপীগুলো প্রোটেষ্টাণ্ট (Protestant) হয়ে যীশুর ধর্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্বর্গের সমন্বয়স্বরূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্তন করলেন, দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হল। তবে ভারতবর্ষে ত্রিশ ক্রোর লোক, দেরী হচ্ছে! ত্রিশ ক্রোর লোককে চেতানো কি একদিনে হয়?

বৌদ্ধধর্মের আর বৈদিক ধর্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধমতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত তো আমাদের এ সর্বনাশ কেন হল? 'কালেতে হয়' বললে কি চলে? কাল কি কার্যকারণসম্বন্ধ ছেড়ে কাজ করতে পারে?

৩. স্বধর্ম বা জাতিধর্ম

অতএব উদ্দেশ্য এক হলেও উপায়হীনতায় বৌদ্ধরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে। বৌদ্ধবন্ধুরা চটে যাও, যাবে; ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। সত্যটা বলা উচিত। উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়–'জাতিধর্ম' 'স্বধর্ম' যেটি বৈদিক ধর্মের–বৈদিক সমাজের ভিত্তি। আবার অনেক বন্ধুকে চটালুম, অনেক বন্ধু বলছেন যে, এ দেশের লোকের খোশামুদি হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের জন্যে বলে রাখা যে, দেশের লোকের খোশামোদ করে আমার লাভটা কি? না খেতে পেয়ে মরে গেলে দেশের লোকে একমুঠো অন্ন দেয় না; ভিক্ষে-শিক্ষে করে বাইরে থেকে এনে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত অনাথকে যদি খাওয়াই তো তার ভাগ নেবার জন্য দেশের লোকের বিশেষ চেষ্টা; যদি না পায় তো গালাগালির চোটে অস্থির!! হে স্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী! এই আমাদের দেশের লোক, তাদের আবার কি খোশামোদ? তবে তারা উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদকে যে ঔষধ খাওয়াতে যাবে, তার হাতে দু-দশটা কামড় অবশ্যই উন্মাদ দেবে; তা সয়ে যে ঔষধ খাওয়াতে যায়, সে-ই যথার্থ বন্ধু।

এই 'জাতিধর্ম' 'স্বধর্মই' সকল দেশে সামাজিক কল্যাণের উপায়–মুক্তির সোপান। ঐ 'জাতিধর্ম' 'স্বধর্ম' নাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশটার অধঃপতন হয়েছে। তবে নিধুরাম সিধুরাম বা জাতিধর্ম স্বধর্ম বলে বুঝেছেন, ওটা উল্টো উৎপাত; নিধু জাতিধর্মের ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন, ওঁর গাঁয়ের আচারকেই সনাতন আচার বলে ধারণা করছেন, নিজের কোলে ঝোল টানছেন, আর উৎসন্ন যাচ্ছেন। আমি গুণগত জাতির কথা বলছি না, বংশগত জাতির কথা বলছি, জন্মগত জাতির কথা বলছি। গুণগত জাতিই আদি, স্বীকার করি; কিন্তু গুণ দু-চার পুরুষে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়। সেই আসল জায়গায় ঘা পড়ছে, নইলে সর্বনাশ হল কেন? 'সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।'৫ কেমন করে এ ঘোর বর্ণসাঙ্কর্য উপস্থিত হল–সাদা রঙ কালো কেন হল, সত্ত্বগুণ রজোগুণপ্রধান তমোগুণে কেন উপস্থিত হল–সে সব অনেক কথা, বারান্তরে বলবার রইল। আপাততঃ এইটি বোঝ যে, জাতিধর্ম যদি ঠিক ঠিক থাকে তো দেশের অধঃপতন হবেই না। এ-কথা যদি সত্য হয়, তা হলে

আমাদের অধঃপতন কেন হল? অবশ্যই জাতিধর্ম উৎসন্নে গেছে। অতএব যাকে তোমরা জাতিধর্ম বলছ, সেটা ঠিক উল্টো। প্রথম পুরাণ পুঁথি-পাটা বেশ করে পড়গে, এখনি দেখতে পাবে যে, শাস্ত্র যাকে জাতিধর্ম বলছে, তা সর্বত্রই প্রায় লোপ পেয়েছে। তারপর কিসে সেইটি ফের আসে, তারই চেষ্টা কর; তা হলেই পরম কল্যাণ নিশ্চিত। আমি যা শিখেছি, যা বুঝেছি তাই তোমাদের বলছি; আমি তো আর বিদেশ থেকে তোমাদের হিতের জন্য আমদানী হইনি যে, তোমাদের আহম্মকিগুলিকে পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হবে? বিদেশী বন্ধুর কি? বাহবা লাভ হলেই হল। তোমাদের মুখে চুনকালি পড়লে যে আমার মুখে পড়ে, তার কি?

পূর্বেই বলেছি যে, প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে বা মহাপুরুষদের প্রতিভাবলে প্রত্যেক জাতির সামাজিক রীতিনীতি সেই উদ্দেশ্যটি সফল করবার উপযোগী হয়ে গড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক জাতির জীবন ঐ উদ্দেশ্যটি এবং তদুপযোগী উপায়রূপ আচার ছাড়া, আর সমস্ত রীতিনীতিই বাড়ার ভাগ। এই বাড়ার ভাগ রীতিনীতিগুলির হ্রাস-বৃদ্ধিতে বড় বেশী এসে যায় না; কিন্তু যদি সেই আসল উদ্দেশ্যটিতে ঘা পড়ে, তখুনি সে জাতির নাশ হয়ে যাবে।

ছেলেবেলায় গল্প শুনেছ যে, রাক্ষসীর প্রাণ একটা পাখীর মধ্যে ছিল। সে পাখীটার নাশ না হলে রাক্ষসীর কিছুতেই নাশ হয় না; এও তাই। আবার দেখবে যে, যে অধিকারগুলো জাতীয় জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, সে অধিকারগুলো সব যাক না, সে জাতি বড় তাতে আপত্তি করে না, কিন্তু যখন যথার্থ জাতীয় জীবনে ঘা পড়ে, তৎক্ষণাৎ মহাবলে প্রতিঘাত করে।

তিনটি বর্তমান জাতির তুলনা কর, যাদের ইতিহাস তোমরা অল্পবিস্তার জান—ফরাসী, ইংরেজ, হিন্দু। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড। প্রজারা সব অত্যাচার অবাধে সয়, করভারে পিষে দাও, কথা নেই; দেশসুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই কর, আপত্তি নেই; কিন্তু যেই সে স্বাধীনতার উপর হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে। কেউ কারু উপর চেপে বসে হুকুম চালাতে পাবে

না, এইটিই ফরাসীচরিত্রের মূলমন্ত্র। 'জ্ঞানী, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ বংশ, নীচ বংশ, রাজ্য-শাসনে সামাজিক স্বাধীনতায় আমাদের সমান অধিকার।'—এর উপর হাত কেউ দিতে গেলেই তাঁকে ভুগতে হয়।

ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ—ইংরেজের আসল কথা। রাজা, কুলীনজাতি-অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয় তো তার হিসাব চাইবে। রাজা আছে, বেশ কথা—মান্য করি, কিন্তু টাকাটি যদি তুমি চাও তো তার কার্য-কারণ, হিসাবপত্রে আমি দু-কথা বলব, বুঝব, তবে দেব। রাজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন; রাজাকে মেরে ফেললে।

হিন্দু বলছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিষ হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা—'মুক্তি'। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বল, সব ঐখানে এক মত। ঐখানটায় হাত দিও না, তা হলেই সর্বনাশ; তা ছাড়া যা কর, চুপ করে আছি। লাথি মার, 'কালো' বল, সর্বস্ব কেড়ে লও—বড় এসে যাচ্ছে না; কিন্তু ঐ দোরটা ছেড়ে রাখ। এই দেখ, বর্তমান কালে পাঠান বংশরা আসছিল যাচ্ছিল, কেউ সুস্থির হয়ে রাজ্য করতে পারছিল না; কেন না, ঐ হিঁদুর ধর্মে ক্রমাগত আঘাত করছিল। আর মোগল রাজা কেমন সুদৃঢ়প্রতিষ্ঠ, কেমন মহাবল হল। কেন? না—মোগলরা ঐ জায়গাটায় ঘা দেয়নি। হিঁদুরাই তো মোগলের সিংহাসনের ভিত্তি, জাহাঙ্গীর, শাজাহান, দারাসেকো—এদের সকলের মা যে হিঁদু। আর দেখ, যেই পোড়া আরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে, অমনি এত বড় মোগল রাজ্য স্বপ্নের ন্যায় উড়ে গেল। ঐ যে ইংরেজের সুদৃঢ় সিংহাসন, এ কিসের উপর? ঐ ধর্মে হাত কিছুতেই দেয় না বলে। পাদরী-পুঙ্গবেরা একটু আধটু চেষ্টা করেই তো '৫৭ সালের হাঙ্গামা উপস্থিত করেছিল। ইংরেজরা যতক্ষণ এইটি বেশ করে বুঝবে এবং পালন করবে, ততক্ষণ ওদের 'তকত তাজ অচল রাজধানী'। বিজ্ঞ বহুদর্শী ইংরেজরাও এ-কথা বোঝে, লর্ড রবার্টসের 'ভারতবর্ষে ৪১ বৎসর'৬ নামক পুস্তক পড়ে দেখ।

এখন বুঝতে পারছ তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখীটি কোথায়?—ধর্মে। সেইটির নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে। আচ্ছা, একজন দেশী পণ্ডিত বলছেন যে, ওখানটায় প্রাণটা রাখবার এত আবশ্যক কি? সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় রাখ না কেন?—যেমন অন্যান্য অনেক দেশে। কথাটি তো হল সোজা; যদি তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, ধর্ম কর্ম সব মিথ্যা, তাহলেও কি দাঁড়ায়, দেখ। অগ্নি তো এক, প্রকার বিভিন্ন। সেই এক মহাশক্তিই ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজে বাণিজ্য সুবিচার-বিস্তার, আর হিঁদুর প্রাণে মুক্তিলাভেচ্ছারূপে বিকাশ হয়েছে। কিন্তু এই মহাশক্তির প্রেরণায় শতাব্দী-কতক নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে ফরাসী বা ইংরেজ চরিত্র গড়ে গেছে এবং তারই প্রেরণায় লক্ষ শতাব্দীর আবর্তনে হিঁদুর জাতীয় চরিত্রের বিকাশ। বলি, আমাদের লাখো বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা, না তোমার বিদেশীর দু-পাঁচশ বৎসরের স্বভাব ছাড়া সোজা? ইংরেজ কেন ধর্মপ্রাণ হোক না, মারামারি কাটাকাটিগুলো ভুলে শান্ত শিষ্টটি হয়ে বসুক না?

আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১,০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে, সে কি আর পাহাড়ে ফিরে যায়, না যেতে পারে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত করে তো ইদিক উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মারা যাবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন করে হোক সমুদ্রে যাবেই দু-দিন আগে বা পরে, দুটো ভাল জায়গার মধ্যে দিয়ে, না হয় দু-একবার আঁস্তাকুড় ভেদ করে। যদি এ দশ হাজার বৎসরের জাতীয় জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নূতন চরিত্র গড়তে গেলেই মরে যাবে বৈ তো নয়।

কিন্তু এ বুদ্ধিটি আগাপাস্তলা ভুল, মাপ কর, অল্পদর্শীর কথা। দেশে দেশে আগে যাও এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ করে দেখ, নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তারপর যদি মাথা থাকে তো ঘামাও, তার উপর নিজেদের পুরাণ পুঁথি-পাটা পড়, ভারতবর্ষের দেশ-দেশান্তর বেশ করে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, খাজা আহাম্মকের চোখে নয়, সব দেখতে পাবে যে, জাতটা ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধকধক করছে, ওপরে ছাই চাপা পড়েছে মাত্র। আর দেখবে যে, এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম; আর

তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটান, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে; নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার চেঁচামেচিই সার, রামচন্দ্র!

তা ছাড়া উপায় তো সব দেশেই সেই এক, অর্থাৎ গোটাকতক শক্তিমান্ পুরুষ যা করছে, তাই হচ্ছে; বাকীগুলো খালি 'ভেড়িয়া-ধসান'৭ বৈ তো নয়। ও তোমার 'পার্লেমেণ্ট' দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান্ পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকীগুলো ভেড়ার দল। তবে ভারতবর্ষে, শক্তিমান্ পুরুষ কে? না—ধর্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান। তাঁরাই সমাজের রীতিনীতি বদলাবার দরকার হলে বদলে দেন। আমরা চুপ করে শুনি আর করি। তবে এত তোমার বাড়ার ভাগ ঐ মেজরিটি ভোট প্রভৃতি হাঙ্গামগুলো নেই, এই মাত্র।

অবশ্য ভোট-ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটি শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না, কিন্তু রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইওরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই। সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্যদেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে। 'গো-রস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠি বিকায়। সতীকো না মিলে ধোতি, কস্‌বিন্ পহনে খাসা॥'৮ যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল; হে রাম! চমকে যেও না, ভাঁওতায় ভুলো না।

একটা কথা বুঝে দেখ। মানুষে আইন করে, না আইনে মানুষ করে? মানুষে টাকা উপায় করে, না টাকা মানুষ করতে পারে? মানুষে নাম-যশ করে, না নাম-যশে মানুষ করে?

মানুষ হও, রামচন্দ্র! অমনি দেখবে ও-সব বাকী আপনা-আপনি গড়গড়িয়ে আসছে। ও পরস্পরের নেড়িকুত্তোর খেয়োখেয়ী ছেড়ে সদুদ্দেশ্য, সদুপায়, সৎসাহস, সদ্বীর্য অবলম্বন কর। যদি জন্মেছ তো একটা দাগ রেখে যাও। 'তুলসী যব জগমে আয়ো জগ হসে তুম রোয়। এয়সী করনী কর্ চলো কি তুম্ হসে জগ রোয়॥'৯—যখন তুমি জন্মেছিলে, তুলসী, সকলে হাসতে লাগলে, তুমি কাঁদতে লাগলে; এখন এমন কাজ করে চল যে, তুমি হাসতে হাসতে মরবে, আর জগৎ তোমার জন্য কাঁদবে। এ পার তবে তুমি মানুষ, নইলে কিসের তুমি?

আর এক কথা বোঝ দাদা, অবশ্য আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। যে মানুষটা বলে আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে; যে জাতটে বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট! 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' তবে দেখ, জিনিষটা আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইমাত্র। আর আসলটা সর্বদা বাঁচিয়ে বাকী জিনিষ শিখতে হবে। বলি—খাওয়া তো সব দেশেই এক; তবে আমরা পা গুটিয়ে বসে খাই, বিলাতীরা পা ঝুলিয়ে বসে খায়। এখন মনে কর যে, আমি এদের রকমে রান্না খাওয়া খাচ্ছি; তা বলে কি এদের মত ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাকতে হবে? আমার ঠ্যাং যে যমের বাড়ী যাবার দাখিলে পড়ে—টানাটানিতে যে প্রাণ যায়, তার কি? কাজেই পা গুটিয়ে, এদের খাওয়া খাব বৈকি। ঐ রকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে, সেটা আমাদের মত করে—পা গুটিয়ে আসল জাতীয় চরিত্রটি বজায় রেখে। বলি, কাপড়ে কি মানুষ হয়, না মানুষে কাপড় পরে? শক্তিমান্ পুরুষ যে পোষাকই পরুক না কেন, লোকে মানে; আর আমার মত আহাম্মক ধোপার বস্তা ঘাড়ে করে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ্য করে না।

৪. শরীর ও জাতিতত্ত্ব

এখন গৌরচন্দ্রিকাটা বড্ড বড় হয়ে পড়ল; তবে দু-দেশ তুলনা করা সোজা হবে, এই ভণিতার পর। এরাও ভাল, আমরাও ভাল; 'কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো, দুয়ো পাল্লা ভারী।' তবে ভালর রকমারী আছে, এইমাত্র।

মানুষের মধ্যে আছেন, আমাদের মতে, তিনটি জিনিষ। শরীর আছেন, মন আছেন, আত্মা আছেন। প্রথম শরীরের কথা দেখা যাক, যা সকলকার চেয়ে বাইরের জিনিষ।

শরীরে শরীরে কত ভেদ, প্রথম দেখ। নাক মুখ গড়ন, লম্বাই চৌড়াই, রঙ চুল—কত রকমের তফাত।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে রঙের তফাত বর্ণসাঙ্কর্যে উপস্থিত হয়। গরম দেশ, ঠাণ্ডা দেশ ভেদে কিছু পরিবর্তন অবশ্য হয়; কিন্তু কালো-সাদার আসল কারণ পৈতৃক। অতি শীতল দেশেও ময়লারঙ জাতি দেখা যাচ্ছে, এবং অতি উষ্ণ দেশেও ধপধপে ফর্সা জাতি বাস করছে। কানাডা-নিবাসী আমেরিকার আদিম মানুষ ও উত্তরমেরুসন্নিহিত দেশ-নিবাসী এস্কিমো প্রভৃতির খুব ময়লা রঙ, আর মহাবিষুবরেখার উপরিস্থিত দ্বীপও সাদারঙ আদিম জাতির বাস; বোর্নিও, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ ইহার নিদর্শন।

এখন আমাদের শাস্ত্রকারদের মতে, হিঁদুর ভেতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাত এবং চীন, হূন, দরদ্, পহ্লব, যবন ও খশ্—এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি—এঁরা হচ্ছেন আর্য। শাস্ত্রোক্ত চীনজাতি—এ বর্তমান 'চীনেম্যান' নয়; ওরা তো সেকালে নিজেদের 'চীনে' বলতেই না। 'চীন' বলে এক বড় জাত কাশ্মীরের উত্তরপূর্বভাগে ছিল; দরদ্‌রাওর—যেখানে এখন ভারত আর আফগানিস্থানের মধ্যে পাহাড়ী জাতসকল, ঐখানে ছিল। প্রাচীন চীন জাতির দু-দশটা বংশধর এখনও আছে। দরদিস্থান এখনও বিদ্যমান। 'রাজতরঙ্গিণী' নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে বারংবার দরদ্‌রাজের প্রভুতার পরিচয় পাওয়া যায়। হূন নামক প্রাচীন জাতি অনেকদিন ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে রাজত্ব করেছিল।

এখন টিবেটীরা নিজেদের হূন বলে; কিন্তু সেটা বোধ হয় 'হিউন'। ফল—মনূক্ত হূন আধুনিক তিব্বতী তো নয়; তবে এমন হতে পারে যে, সেই আর্য হূন এবং মধ্য আশিয়া হতে সমাগত কোন মোগলাই জাতির সংমিশ্রণে বর্তমান তিব্বতীর উৎপত্তি। প্রজাবলস্কি (Prjevalski) এবং ড্যুক ড অরলিআ (Due d' Orleans) নামক রুশ ও ফরাসী পর্যটকদের মতে তিব্বতের স্থানে স্থানে এখনও আর্য-মুখ-চোখ-বিশিষ্ট জাতি দেখতে পাওয়া যায়।

যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম। এই নামটার উপর অনেক বিবাদ হয়ে গেছে। অনেকের মতে—যবন এই নামটা 'য়োনিয়া' (Ionia) নামক স্থানবাসী গ্রীকদের উপর প্রথম ব্যবহার হয়, এজন্য মহারাজ অশোকের পালি লেখে 'যোন' নামে গ্রীকজাতি অভিহিত। পরে 'যোন' হতে সংস্কৃত যবন শব্দের উৎপত্তি। আমাদের দিশী কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে 'যবন' শব্দ গ্রীকবাচী নয়। কিন্তু এ সমস্তই ভুল। 'যবন' শব্দই আদি শব্দ, কারণ শুধু যে হিঁদুরাই গ্রীকদের যবন বলত তা নয়; প্রাচীন মিসরী ও বাবিলরাও গ্রীকদের যবন নামে আখ্যাত করত। 'পহ্লব' শব্দে পেহলবী-ভাষাবাদী প্রাচীন পারসী জাতি। 'খশ্' শব্দে এখনও অর্ধসভ্য পার্বত্যদেশবাসী আর্যজাতি—এখনও হিমালয়ে ঐ নাম ঐ অর্থে ব্যবহার হয়। বর্তমান ইওরোপীরাও এই অর্থে খশ্দের বংশধর। অর্থাৎ যে সকল আর্যজাতি প্রাচীনকালে অসভ্য অবস্থায় ছিল, তারা সব খশ্।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে আর্যদের লালচে সাদা রঙ, কালো বা লাল চুল, সোজা নাক চোখ ইত্যাদি; এবং মাথার গড়ন, চুলের রঙ ভেদে একটু তফাত। যেখানে রঙ কালো, সেখানে অন্যান্য কালো জাতের সঙ্গে মিশে এইটি দাঁড়িয়েছে। এঁদের মতে হিমালয়ের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত দু-চার জাতি এখনও পুরো আর্য আছে, বাকী সমস্ত খিচুরিজাত,১০ নইলে কালো কেন হল? কিন্তু ইওরোপী পণ্ডিতদের এখনও ভাবা উচিত যে, দক্ষিণ ভারতেও অনেক শিশুর লাল চুল জন্মায়, কিন্তু দু-চার বৎসরেই চুল ফের কালো হয়ে যায় এবং হিমালয়ে অনেক লাল চুল, নীল বা কটা চোখ।

এখন পণ্ডিতেরা লড়ে মরুন! আর্য নাম হিঁদুরাই নিজেদের উপর চিরকাল ব্যবহার করেছে। শুদ্ধ হোক, মিশ্র হোক, হিঁদুদের নাম আর্য, বস্। কালো বলে ঘৃণা হয়, ইওরোপীরা অন্য নাম নিনগে। আমাদের তায় কি?

কিন্তু কালো হোক, গোরা হোক, দুনিয়ার সব জাতের চেয়ে এই হিঁদুর জাত সুশ্রী সুন্দর। এ-কথা আমি নিজের জাতের বড়াই করে বলছি না, কিন্তু এ-কথা জগৎপ্রসিদ্ধ। শতকরা সুশ্রী নরনারীর সংখ্যা এদেশের মত আর কোথায়? তার উপর ভেবে দেখ, অন্যান্য দেশে সুশ্রী হতে যা লাগে, আমাদের দেশে তার চেয়ে ঢের বেশী; কেন না, আমাদের শরীর অধিকাংশই খোলা। অন্য দেশে কাপড় চোপড় ঢেকে বিশ্রীকে ক্রমাগত সুশ্রী করবার চেষ্টা।

কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক সুখী। এ-সব দেশে ৪০ বৎসরের পুরুষকে জোয়ান বলে—ছোঁড়া বলে; ৫০ বৎসরের স্ত্রীলোক যুবতী। অবশ্য এরা ভাল খায়, ভাল পরে, দেশ ভাল এবং সর্বাপেক্ষা আসল কথা হচ্ছে—অল্প বয়সে বে করে না। আমাদের দেশেও যে দু-একটা বলবান্ জাতি আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে দেখ, কত বয়সে বে করে। গোরখা, পাঞ্জাবী, জাঠ, আফ্রিদি প্রভৃতি পার্বত্যদের জিজ্ঞাসা কর। তারপর শাস্ত্র পড়ে দেখ ৩০, ২৫, ২০ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বে-র বয়স। আয়ু, বল, বীর্য এদের আর আমাদের অনেক ভেদ; আমাদের 'বল, বুদ্ধি, ভরসা—তিন পেরুলেই ফর্সা'; এরা তখন সব গা ঝেড়ে উঠছে।

আমরা নিরামিষাশী, আমাদের অধিকাংশ রোগ পেটে; উদরভঙ্গে বুড়োবুড়ী মরে। এরা মাংসাশী, এদের অধিক রোগই বুকে। হৃদরোগে ফুসফুস রোগে এদের বুড়োবুড়ী মরে। একজন এদেশী বিজ্ঞ ডাক্তার-বন্ধু জিজ্ঞাসা করছেন যে, পেটের রোগগ্রস্ত লোকেরা কি প্রায় নিরুৎসাহ, বৈরাগ্যবান্ হয়? হৃদয়াদি উপরের শরীরের রোগে আশা-বিশ্বাস পুরো থাকে। ওলাউঠা রোগী গোড়া থেকেই মৃত্য ভয়ে অস্থির হয়। যক্ষ্মারোগী মরবার সময় পর্যন্ত বিশ্বাস রাখে যে, সে সেরে উঠবে। অতএব সে জন্যেই কি ভারতের লোক সর্বদাই 'মরণ মরণ' আর 'বৈরাগ্য বৈরাগ্য' করছে? আমি তো এখনও উত্তর দিতে পারি নাই; কিন্তু কথাটা ভাববার বটে।

আমাদের দেশে দাঁতের রোগ, চুলের রোগ খুব কম। এ সব দেশে অতি অল্প লোকেরই নিজের স্বাভাবিক দাঁত আর টাকের ছড়াছড়ি। আমরা নাক ফুঁড়ছি, কান ফুঁড়ছি গহনা পরবার জন্য। এরা এখন ভদ্রলোকে বড় নাক-কান ফোঁড়ে না; কিন্তু কোমর বেঁধে বেঁধে, শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে, পিলে যকৃৎকে স্থানভ্রষ্ট করে শরীরটাকে বিশ্রী করে বসে। 'গড়ন গড়ন' করে এরা মরে, তায় ঐ বস্তাবন্দী কাপড়ের উপর গড়ন রাখতে হবে।

৫. পোষাক ও ফ্যাশন

এদের পোষাক কাজকর্ম করবার অত্যন্ত উপযোগী; ধনী লোকের স্ত্রীদের সামাজিক পোষাক ছাড়া [সাধারণ] মেয়েদের পোষাকও হতচ্ছাড়া। আমাদেরে মেয়েদের শাড়ী আর পুরুষদের চোগা-চাপকান-পাগড়ির সৌন্দর্যের এ পৃথিবীতে তুলনা নেই। ভাঁজ ভাঁজ পোষাকে যত রূপ, তত আঁটাসাটায় হয় না। আমাদের পোষাক সমস্তই ভাঁজ ভাঁজ, কিন্তু আমাদের কাজকর্মের পোষাক নেই; কাজ করতে গেলেই কাপড়-চোপড় বিসর্জন যায়। এদের ফ্যাশন কাপড়ে, আমাদের ফ্যাশন গয়নায়; এখন কিছু কিছু কাপড়েও হচ্ছে।

ফ্যাশনটা কি, না–ঢঙ; মেয়েদের কাপড়ের ঢঙ–প্যারিস শহর থেকে বেরোয়; পুরুষদের–লণ্ডন থেকে। আগে প্যারিসের নর্তকীরা এই ঢঙ ফেরাত। একজন বিখ্যাত নটী যা পোষাক পরলে, সকলে অমনি দৌড়ুল তাই করতে। এখন দোকানীর ঢঙ [সৃষ্টি] করে। কত ক্রোর টাকা যে এই পোষাক করতে লাগে প্রতি বৎসর, তা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। এ পোষাক গড়া এক প্রকাণ্ড বিদ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ মেয়ের গায়ের চুলের রঙের সঙ্গে কোন্ রঙের কাপড় সাজন্ত হবে, কার শরীরের কোন্ গড়নটা ঢাকতে হবে, কোন্টা বা পরিস্ফুট করতে হবে, ইত্যাদি অনেক মাথা ঘামিয়ে পোষাক তৈরী করতে হয়। তারপর দু-চারজন উচ্চপদস্থ মহিলা যা পরেন, বাকী সকলকে তাই পরতে হয়, না পরলে জাত যায়!! এর নাম ফ্যাশন! আবার এই ফ্যাশন ঘড়ি-ঘড়ি বদলাচ্ছে, বছরে চার ঋতুতে চার বার বদলাবেই তো, তা ছাড়া অন্য সময়েও আছে।

যারা বড় মানুষ, তারা দরজী দিয়ে পোষাক করিয়ে নেয়; যারা মধ্যবিৎ ভদ্রলোক--তারা কতক নিজের হাতে, কতক ছুটকো-ছাটকা মেয়ে-দরজী দিয়ে নূতন ধরনের পোষাক গড়িয়ে নেয়। পরবর্তী ফ্যাশন যদি কাছাকাছি রকমের হয় তো পুরানো কাপড় বদলে-সদলে নেয়, নতুবা নূতন কেনে। বড় মানুষেরা ফি-ঋতুতে কাপড়গুলি চাকর-বাকরদের দান করে। মধ্যবিত্তেরা বেচে ফেলে; তখন সে কাপড়গুলি ইওরোপী লোকদের যে সমস্ত উপনিবেশ আছে–আফ্রিকা, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়ায়–সেথায় গিয়ে হাজির হয়, এবং তারা

পরে। যারা খুব ধনী, তাদের কাপড় প্যারিস হতে তৈয়ার হয়ে আসে; বাকীরা নিজেদের দেশে সেগুলি নকল করে পরে! কিন্তু মেয়েদের টুপিটি আসল ফরাসী হওয়া চাই-ই চাই। যার তা নয় সে লেডি নয়।

ইংরেজের মেয়েদের আর জার্মান মেয়েদের পোষাক বড় খারাপ; ওরা বড় প্যারিস ঢঙে পোষাক পরে না—দু-দশজন বড় মানুষ ছাড়া; এইজন্য অন্যান্য দেশের মেয়েরা ওদের ঠাট্টা করে। ইংরেজ পুরুষরা খুব ভাল পোষাক পরে—অনেকেই। আমেরিকার মেয়ে পুরুষ সকলেই খুব ঢঙসই পোষাক পরে। যদিও আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট প্যারিস বা লণ্ডনের আমদানী পোষাকের উপর খুব মাশুল বসায়, যাতে বিদেশী মাল এ দেশে না আসে, তথাপি মাশুল দিয়েও মেয়েরা প্যারিস ও পুরুষরা লণ্ডনের তৈরী পোষাক পরে। নানা রকমের নানা রঙের পশমিনা, বনাত, রেশমী কাপড় রোজ রোজ বেরুচ্ছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাইতে লেগে আছে, লক্ষ লক্ষ লোক তাই কেটে ছেঁটে পোষাক করছে। ঠিক ঢঙের পোষাক না হলে জেণ্টলম্যান বা লেডির রাস্তায় বেরুনই মুশকিল।

আমাদের দেশে এ ফ্যাশনের হাঙ্গাম কিছু কিছু গহনায় ঢুকছে। এ-সব দেশের পশম-রেশম-তাঁতীদের নজর দিনরাত—কি বদলাচ্ছে বা না বদলাচ্ছে, লোকে কি রকম পছন্দ করছে, তার উপর; অথবা নূতন একটা করে লোকের মন আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। একবার আন্দাজ লেগে গেলেই সে ব্যবসাদার বড়মানুষ। যখন তৃতীয় ন্যাপলেঅঁ ফরাসী দেশের বাদশা ছিলেন, তখন সম্রাজ্ঞী অজেনি (Eugenie) পাশ্চাত্য জগতের বেশভূষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর কাশ্মীরী শাল বড় পছন্দ ছিল। কাজেই লাখো টাকার শাল ইওরোপ প্রতি বৎসর কিনত। তাঁর পতন অবধি সে ঢঙ বদলে গেছে। শাল আর বিক্রী হয় না। আর আমাদের দেশের লোক দাগাই বুলোয়; নূতন একটা কিছু করে সময়মত বাজার দখল করতে পারলে না; কাশ্মীর বেজায় ধাক্কা খেলে, বড় বড় সদাগর গরীব হয়ে গেল।

এ সংসার—'দেখ্ তোর, না দেখ মোর', কেউ কারু জন্য দাঁড়িয়ে আছে? ওরা দশ চোখ, দুশ হাত দিয়ে দেখছে, খাটছে; আমরা—'গোঁসাইজী যা পুঁথিতে' লেখেননি—তা কখনই করব না, করবার শক্তিও গেছে। অন্ন বিনা হাহাকার!! দোষ কার? প্রতিবিধানের চেষ্টা

তো অষ্টরম্ভা; খালি চীৎকার হচ্ছে; বস্! কোণ থেকে বেরোও না—দুনিয়াটা কি, চেয়ে দেখ না। আপনা-আপনি বুদ্ধিসুদ্ধি আসবে।

দেবাসুরের গল্প তো জানই। দেবতারা আস্তিক—আত্মায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে—পরলোকে বিশ্বাস রাখে। অসুররা বলছে—ইহলোকে এই পৃথিবী ভোগ কর, এই শরীরটাকেই সুখী কর। দেবতা ভাল, কি অসুর ভাল, সে কথা হচ্ছে না। বরং পুরাণের অসুরগুলোই তো দেখি মনিষ্যির মত, দেবতাগুলো অনেকাংশে হীন। এখন যদি বোঝ যে তোমরা দেবতার বাচ্চা আর পাশ্চাত্যেরা অসুরবংশ, তা হলেই দু-দেশ বেশ বুঝতে পারবে।

৬. পরিচ্ছন্নতা

দেখ, শরীর নিয়ে প্রথম। বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি হচ্ছে—পবিত্রতা। মাটি জল প্রভৃতির দ্বারা শরীর শুদ্ধ হয়—উত্তম। দুনিয়ার এমন জাত কোথাও নেই যাদের শরীর হিঁদুদের মত সাফ। হিঁদু ছাড়া আর কোন জাত জলশৌচাদি করে না। তবু পাশ্চাত্যদের—চীনেরা কাগজ ব্যবহার করাতে শিখিয়েছে, কিছু বাঁচোয়া। স্নান নেই বললেই হয়। এখন ইংরেজরা ভারতে এসে স্নান ঢুকিয়েছে দেশে। তবুও যে-সব ছেলেরা বিলেতে পড়ে এসেছে তাদের জিজ্ঞাসা কর, স্নানের কি কষ্ট! যারা স্নান করে—সে সপ্তায় এক দিন—সে-দিন ভেতরের কাপড় আণ্ডারওয়ার বদলায়। অবশ্য এখন পয়সাওয়ালাদের ভেতর অনেকে নিত্যস্নায়ী। আমেরিকানরা একটু বেশী! জার্মান—কালেভদ্রে; ফরাসী প্রভৃতি কস্মিন্ কালেও না!!! স্পেন ইতালী অতি গরম দেশ, সে আরও নয়—রাশীকৃত লশুন খাওয়া, দিনরাত ঘর্মাক্ত, আর সাত জন্মে জলস্পর্শও না! সে গায়ের গন্ধে ভূতের চৌদ্দপুরুষ পালায়—ভূত তো ছেলেমানুষ! 'স্নান' মানে কি—মুখটি মাথাটি ধোয়া, হাত ধোয়া—যা বাহিরে দেখা যায়। আবার কি! প্যারিস, সভ্যতার রাজধানী প্যারিস, রঙ-ঢঙ ভোগবিলাসের ভূস্বর্গ প্যারিস, বিদ্যা-শিল্পের কেন্দ্র প্যারিস, সেই প্যারিসে এক বৎসর এক বড় ধনী বন্ধু নিমন্ত্রণ করে আনলেন। এক প্রাসাদোপম মস্ত হোটেলে নিয়ে তুললেন—রাজভোগ খাওয়া-দাওয়া, কিন্তু স্নানের নামটি নেই। দুদিন ঠায় সহ্য করে—শেষে আর পারা গেল না। শেষে বন্ধুকে বলতে হল—দাদা, তোমার এ রাজভোগ তোমারই থাকুক, আমার এখন 'ছেঁড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি' হয়েছে। এই দারুণ গরমিকাল, তাতে স্নান করবার যো নেই, হন্যে কুকুর হবার যোগাড় হয়েছে। তখন বন্ধু দুঃখিত হয়ে চটে বললেন যে, এমন হোটেলে থাকা হবে না, চল ভাল জায়গা খুঁজে নিইগে। বারোটা প্রধান প্রধান হোটেলে খোঁজা হল, স্নানের স্থান কোথাও নেই। আলাদা স্নানাগার সব আছে, সেখানে গিয়ে ৪।৫ টাকা দিয়ে একবার স্নান হবে। হরিবোল হরি! সে দিন বিকালে কাগজে পড়া গেল—এক বুড়ী স্নান করতে টবের মধ্যে বসেছিল, সেইখানেই মারা পড়েছে!! কাজেই জন্মের মধ্যে একবার বুড়ী চামড়ার সঙ্গে জলস্পর্শ হতেই কুপোকাত!! এর একটি কথা অতিরঞ্জিত নয়। রুশ-ফুশগুলো তো

আসল ম্লেচ্ছ, তিব্বত থেকেই ও ঢঙ আরম্ভ। আমেরিকায় অবশ্য প্রত্যেক বাসাবাড়ীতে একটা করে স্নানের-ঘর ও জলের পাইপের বন্দোবস্ত আছে।

কিন্তু তফাত দেখ! আমরা স্নান করি কেন?—অধর্মের ভয়ে; পাশ্চাত্যেরা হাত-মুখ ধোয়—পরিষ্কার হবে বলে। আমাদের জল ঢাললেই হল, তা তেলই বেড়-বেড় করুক আর ময়লাই লেগে থাকুক! আবার দক্ষিণী ভায়া স্নান করে এমন লম্বা চওড়া তেলক কাটলেন যে, ঝামারও সাধ্য নয় তাকে ঘষে তোলে। আবার আমাদের স্নান সোজা কথা, যেখানে হোক ডুব লাগালেই হল। ওদের—সে এক বস্তা কাপড় খুলতে হবে তার বন্ধনই বা কি! আমাদের গা দেখাতে লজ্জা নেই, ওদের বেজায়। তবে পুরুষে পুরুষে কিছুমাত্র নেই, বাপ বেটার সামনে উলঙ্গ হবে—দোষ নেই। মেয়েছেলের সামনে আপাদমস্তক ঢাকতে হবে।

'বহিরাচার' অর্থাৎ পরিষ্কার থাকাটা, অন্যান্য আচারের ন্যায়, কখনও কখনও অত্যাচার বা অনাচার হয়ে পড়ে। ইওরোপী বলে যে, শরীর-সম্বন্ধী সমস্ত কার্য অতি গোপনে করা উচিত। উত্তম কথা। এই শৌচাদি তো দূরের কথা; লোকমধ্যে থুথু ফেলা একটা মহা অভদ্রতা! খেয়ে আঁচানো সকলের সামনে অতি লজ্জার কথা, কেন না কুলকুচো করা তায় আছে। লোকলজ্জার ভয়ে খেয়ে দেয়ে মুখটি মুছে বসে থাকে—ক্রমে দাঁতের সর্বনাশ হয়। সভ্যতার ভয়ে অনাচার। আমাদের আবার দুনিয়ার লোকের সামনে রাস্তায় বসে বমির নকল করতে করতে মুখ ধোওয়া, দাঁত মাজা, আঁচানো—এটা অত্যাচার। ও-সমস্ত কার্য গোপনে করা উচিত নিশ্চিত, তবে না করাও অনুচিত।

আবার দেশভেদে যে সকল কার্য অনিবার্য, সেগুলো সমাজ সয়ে নেয়! আমাদের গরম দেশে খেতে বসে আধ ঘড়াই জল খেয়ে ফেলি—এখন ঢেঁকুর না তুলে যাই কোথা; কিন্তু ঢেঁকুর তোলা পাশ্চাত্য দেশে অতি অভদ্রের কাজ। কিন্তু খেতে খেতে রুমাল বার করে দিব্যি নাক ঝাড়ো—তত দোষের নয়; আমাদের দেশে ঘৃণার কথা। এ ঠাণ্ডা দেশে মধ্যে মধ্যে নাক না ঝেড়ে থাকা যায় না।

ময়লাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে আমরা ময়লা হয়ে থাকি অনেক সময়। ময়লায় আমাদের এত ঘৃণা যে ছুঁলে নাইতে হয়; সেই ভয়ে স্তূপাকৃতি ময়লা দোরের পাশে পচতে দিই। না ছুঁলেই হল! এদিকে যে নরককুণ্ডে বাস হচ্ছে, তার কি? একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার। একটা পাপ এড়াতে গিয়ে, আর একটা গুরুতর পাপ করছি। যার বাড়ীতে ময়লা সে পাপী, তাতে আর সন্দেহ কি? তার সাজাও তাকে মরে পেতে হবে না, অপেক্ষাও বড় বেশী করতে হবে না।

আমাদের রান্নার মত পরিষ্কার রান্না কোথাও নেই। বিলেতী খাওয়ার শৃঙ্খলার মত পরিষ্কার পদ্ধতি আমাদের নেই। আমাদের রাঁধুনী স্নান করছে, কাঁপড় বদলেছে; হাঁড়িপত্র, উনুন—সব ধুয়ে মেজে সাফ করেছে; নাকে মুখে গায়ে হাত ঠেকলে তখনি হাত ধুয়ে তবে আবার খাদ্যদ্রব্যে হাত দিচ্ছে। বিলাতী রাঁধুনীর চৌদ্দ-পুরুষে কেউ স্নান করেনি; রাঁধতে রাঁধতে চাখছে, আবার সেই চামচে হাঁড়িতে ডোবাচ্ছে।

রুমাল বার করে ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লে, আবার সেই হাতে ময়দা মাখলে। শৌচ থেকে এল—কাগজ ব্যবহার করে, সে হাত ধোবার নামটিও নেই—সেই হাতে রাঁধতে লাগল। কিন্তু ধপধপে কাপড় আর টুপি পরেছে। হয়তো একটা মস্ত কাঠের টবের মধ্যে দুটো মানুষ উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে রাশীকৃত ময়দার উপর নাচছে—কিনা ময়দা মাখা হচ্ছে। গরমি কাল—দরবিগলিত ঘাম পা বেয়ে সেই ময়দায় সেঁধুচ্ছে। তারপর তার রুটি তৈয়ার যখন হল, তখন দুগ্ধফেননিভ তোয়ালের উপর চীনের বাসনে সজ্জিত হয়ে পরিষ্কার চাদর বিছানো টেবিলের উপর, পরিষ্কার কাপড় পরা কনুই পর্যন্ত সাদা দস্তানা-পরা চাকর এনে সামনে ধরলে! কোন জিনিষ হাত দিয়ে পাছে ছুঁতে হয়, তাই কনুই পর্যন্ত দস্তানা।

আমাদের স্নান-করা বামুন, পরিষ্কার বাসনে পরিষ্কার হাঁড়িতে, শুদ্ধ হয়ে রেঁধে গোময়সিক্ত মাটির উপর থালসুদ্ধ অন্নব্যঞ্জন ঝাড়লে; বামুনের কাপড়ে খামছে ময়লা উঠছে। হয়তো মাটি ময়লা গোবর আর ঝোল কলাপাতা ছেঁড়ার দরুন একাকার হয়ে এক অপূর্ব আস্বাদ উপস্থিত করলে!!

আমরা দিব্যি স্নান করে একখানা তেলচিটে ময়লা কাপড় পরলুম, আর ইওরোপে ময়লা গায়ে, না নেয়ে একটা ধপধপে পোষাক পরলে। এইটি বেশ করে বোঝ, এইটি আগাগোড়ার তফাত–হিঁদুর সেই অন্তদৃষ্টি, তা আগাপাস্তলা সমস্ত কাজে। হিঁদু–ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহিনুর রাখে; বিলাতী–সোনার বাক্সয় মাটির ডেলা রাখে! হিঁদুর শরীর পরিষ্কার হলেই হল, কাপড় যা তা হোক! বিলাতীর কাপড় সাফ থাকলেই হল, গায়ে ময়লা রইলই বা! হিঁদুর ঘর দোর ধুয়ে মেজে সাফ, তার বাইরে নরককুণ্ড থাকুক না কেন! বিলাতীর মেজে কার্পেটে মোড়া ঝকঝকে, ময়লা সব ঢাকা থাকলেই হল!! হিঁদুর পয়োনালী রাস্তার উপর–দুর্গন্ধে বড় এসে যায় না। বিলাতীর পয়োনালী রাস্তার নীচে–টাইফয়েড ফিভারের বাসা!! হিঁদু করছেন ভেতর সাফ। বিলাতী করছেন বাইরে সাফ।

চাই কি?–পরিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখধোয়া দাঁতমাজা–সব চাই, কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই। রাস্তাঘাটও পরিষ্কার চাই। পরিষ্কার রাঁধুনী, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই। আবার পরিষ্কার মনোরম স্থানে পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই–'আচারঃ প্রথমো ধর্মঃ।' আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া।–সব রকমে পরিষ্কার হওয়া আচার-ভ্রষ্টের কখনও ধর্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখছ না, দেখেও শিখছ না? এত ওলাউঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া–কার দোষ? আমাদের দোষ। আমরা মহা অনাচারী!!!

৭. আহার ও পানীয়

আহার শুদ্ধ হলে মন শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হলে আত্মসম্বন্ধীয় অচলা স্মৃতি হয়—এ শাস্ত্রবাক্য আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়ই মেনেছেন। তবে শঙ্করাচার্যের মতে১১ 'আহার' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়জ্ঞান আর রামানুজাচার্যের মতে ভোজ্যদ্রব্য। সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, দুই অর্থই ঠিক। বিশুদ্ধ আহার না হলে ইন্দ্রিয়সকল যথাযথ কার্য কি করেই বা করে? কদর্য আহারে ইন্দ্রিয়সকলের গ্রহণশক্তির হ্রাস হয় বা বিপর্যয় হয়, এ-কথা সকলেরই প্রত্যক্ষ। অজীর্ণ দোষে এক জিনিষকে আর এক বলে ভ্রম হওয়া এবং আহারের অভাবে দৃষ্টি আদি শক্তির হ্রাস সকলেই জানেন। সেই প্রকার কোন বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা উপস্থিত করে, তাও ভূয়োদর্শনসিদ্ধ। আমাদের সমাজে যে এত খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার, তার মূলেও এই তত্ত্ব; যদিও অনেক বিষয়ে আমরা বস্তু ভুলে আধারটা নিয়েই টানা-হেঁচড়া করছি এখন।

রামানুজাচার্য ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলছেন। জাতিদোষ অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্যদ্রব্যের জাতিগত; যেমন প্যাঁজ লশুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। আশ্রয়দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তিবিশেষের স্পর্শ হতে আসে; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলেই দুষ্টবুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সদ্‌বুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্তদোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য কীট-কেশাদি-দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে। এর মধ্যে জাতিদোষ এবং নিমিত্তদোষ থেকে বাঁচবার চেষ্টা সকলেই করতে পারে, আশ্রয়দোষ হতে বাঁচা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই আশ্রয়দোষ থেকে বাঁচবার জন্যই আমাদের দেশে ছুঁৎমার্গ—'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।' তবে অনেক স্থলেই 'উল্টা সমঝ্‌লি রাম' হয়ে যায় এবং মানে না বুঝে একটা কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। এস্থলে লোকাচার ছেড়ে লোকগুরু মহাপুরুষদের আচারই গ্রহণীয়। শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি জগদ্‌গুরুদের জীবনী পড়ে দেখ, তাঁরা এ সম্বন্ধে কি ব্যবহার করে গেছেন। জাতিদুষ্ট অন্নভোজন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মত শিক্ষার স্থল এখনও পৃথিবীতে কোথাও নেই। সমস্ত ভূমণ্ডলে আমাদের দেশের মত পবিত্র

দ্রব্য আহার করে, এমন আর কোন দেশ নেই। নিমিত্ত-দোষ সম্বন্ধে বর্তমান কালে বড়ই ভয়ানক অবস্থা দাঁড়িয়েছে; ময়রার দোকান, বাজারে খাওযা, এ সব মহা অপবিত্র দেখতেই পাচ্ছ, কিরূপ নিমিত্তদোষে দুষ্ট ময়লা আবর্জনা পচা পক্কড় সব ওতে আছেন—এর ফল হচ্ছে তাই। এই যে ঘরে ঘরে অজীর্ণ, ও ঐ ময়রার দোকানে—বাজারে খাওয়ার ফল। এই যে প্রসাবের ব্যারামের প্রকোপ, ও-ও ঐ ময়রার দোকান। ঐ যে পাড়াগেঁয়ে লোকের তত অজীর্ণদোষ, প্রস্রাবের ব্যারাম হয় না, তার প্রধান কারণ হচ্ছে লুচি কচুরি প্রভৃতি 'বিষলড্ডকে'র অভাব। এ-কথা বিস্তার করে পরে বলছি।

এই তো গেল খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে প্রাচীন সাধারণ নিয়ম। এ নিয়মের মধ্যে আবার অনেক মতামত প্রাচীন কালে চলেছে এবং আধুনিক কালে চলছে। প্রথম—প্রাচীনকাল হতে আধুনিক কাল পর্যন্ত এক মহা বিবাদ—আমিষ আর নিরামিষ। মাংসভোজন উপকারক কি অপকারক? তা ছাড়া জীবহত্যা ন্যায় বা অন্যায়, এ এক মহা বিতণ্ডা চিরদিনের। এক পক্ষ বলছেন—কোন কারণে হত্যারূপ পাপ করা উচিত নয়; আর এক পক্ষ বলছেন—রাখ তোমার কথা, হত্যা না করলে প্রাণধারণই হয় না। শাস্ত্রবাদীদের ভেতর মহাগোল। শাস্ত্রে একবার বলছেন, যজ্ঞস্থলে হত্যা কর; আবার বলছেন, জীবঘাত কর না। হিঁদুরা সিদ্ধান্ত করছেন যে, যজ্ঞ ছাড়া অন্যত্র হত্যা করা পাপ। কিন্তু যজ্ঞ করে সুখে মাংস ভোজন কর। এমন কি, গৃহস্থের পক্ষে অনেকগুলি নিয়ম আছে যে, সে-সে স্থলে হত্যা না করলে পাপ—যেমন শ্রাদ্ধাদি। সে-সকল স্থলে নিমন্ত্রিত হয়ে মাংস না খেলে পশুজন্ম হয়, মনু বলছেন। অপর দিকে জৈন বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলছেন যে, তোমার শাস্ত্র মানিনি, হত্যা করা কিছুতেই হবে না। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক, যে যজ্ঞ করবে বা নিমন্ত্রণ করে মাংস খাওয়াবে, তাকে সাজা দিচ্ছেন।

আধুনিক বৈষ্ণব পড়েছেন কিছু ফাঁপরে, তাঁদের ঠাকুর রাম বা কৃষ্ণ মদ-মাংস দিব্যি ওড়াচ্ছেন, রামায়ণ-মহাভারতে রয়েছে। সীতাদেবী গঙ্গাকে মাংস, ভাত আর হাজার কলসী মদ মানছেন!১২ বর্তমান কালে শাস্ত্রও শুনবে না, মহাপুরুষ বলেছেন বললেও শোনে না।পাশ্চাত্যদেশে এরা লড়ছে যে, মাংস খেলে রোগ হয়, নিরামিষাশী নিরোগ হয়

ইত্যাদি। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারীর যত রোগ; অপর পক্ষ বলছেন, ও গল্পকথা, তাহলে হিঁদুরা নীরোগ হত, আর ইংরেজ আমেরিকান প্রভৃতি প্রধান প্রধান মাংসাহারী জাত রোগে লোপাট হয়ে যেত এত দিনে। এক পক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে। অপর পক্ষ বলছেন যে, কপি খেলে কোপো বুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি। জড়বুদ্ধির চেয়ে চৈতন্যবুদ্ধি হওয়া ভাল। এক পক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা আছে, মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বলছেন যে, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন, ভাত-ডালে যা আছে, মাংসেও তাই; অপর পক্ষ বলছেন, হাওয়াতেও তাই, তবে তুমি হওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন, হাওয়াতে তাই, তবে তুমি হাওয়া খেয়ে থাক। এক পক্ষ বলছেন যে, নিরামিষ খেয়েও লোকে কত পরিশ্রম করতে পারে; অপর পক্ষ বলছেন, তা হলে নিরামিষাশী জাতিই প্রধান হত; চিরকাল মাংসাশী জাতিই বলবান্ ও প্রধান। মাংসাহারী বলছে, হিঁদু চীনে দেখ, খেতে পায় না, ভাত খেয়ে শাক-পাতড়া খেয়ে মরে, ওদের দুর্দশা দেখ—আর জাপানীরাও ঐ ছিল; মাংসাহার আরম্ভ করে অবধি ওদের ভোল ফিরে গেছে।ভারতবর্ষে দেড় লাখ হিন্দুস্থানী সেপাই, এদের মধ্যে কয়জন নিরামিষ খায় দেখ। উত্তম সেপাই গোরখা বা শিখ কে কবে নিরামিষাশী দেখ। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংসাহারে বদহজম, আর এক পক্ষ বলছেন—সব ভুল, নিরামিষাশীগুলোরই যত পেটের রোগ। এক পক্ষ বলছেন, তোমার কোষ্ঠশুদ্ধিরোগ শাক-পাতড়া খেয়ে জোলাপবৎ ভাল হয়ে যায়, তা বলে কি দুনিয়াসুদ্ধকে তাই করতে চাও? ফলকথা, চিরকালই মাংসাশী জাতিরাই যুদ্ধবীর, চিন্তাশীল ইত্যাদি। মাংসাশী জাতেরা বলছেন যে, যখন যজ্ঞের ধুম দেশময় উঠত, তখনই হিঁদুর মধ্যে ভাল ভাল মাথা বেরিয়েছে, এ বাবাজীডৌল হয়ে পর্যন্ত একটাও মানুষ জন্মাল না। এ বিধায় মাংসাশীরা ভয়ে মাংসাহার ছাড়তে চায় না। আমাদের দেশে আর্যসমাজী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাদ উপস্থিত। এক পক্ষ বলছেন যে, মাংস খাওয়া একান্ত আবশ্যক; আর পক্ষ বলছেন, একান্ত অন্যায়। এই তো বাদ-বিবাদ চলছে।

সকল পক্ষ দেখে শুনে আমার তো বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছে যে, হিঁদুরাই ঠিক, অর্থাৎ হিঁদুদের ঐ যে ব্যবস্থা যে জন্ম-কর্ম-ভেদ আহারাদি সমস্তই পৃথক্, এইটিই সিদ্ধান্ত। মাংস খাওয়া অবশ্য অসভ্যতা, নিরামিষ-ভোজন অবশ্যই পবিত্রতর। যার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ধর্মজীবন, তাঁর পক্ষে নিরামিষ; আর যাকে খেটেখুটে এই সংসারের দিবারাত্রি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জীবনতরী চালাতে হবে, তাকে মাংস খেতে হবে বৈকি। যতদিন মনুষ্য-সমাজে এই ভাব থাকবে—'বলবানের জয়', ততদিন মাংস খেতে হবে বা অন্য কোন রকম মাংসের ন্যায় উপযোগী আহার আবিষ্কার করতে হবে। নইলে বলবানের পদতলে দুর্বল পেষা যাবেন! রাম কি শ্যাম নিরামিষ খেয়ে ভাল আছেন বললে চলে না—জাতি জাতির তুলনা করে দেখ।

আবার নিরামিষাশীদের মধ্যেও হচ্ছে কোঁদল। এক পক্ষ বলছেন যে ভাত, আলু, গম, যব, জনার প্রভৃতি শর্করাপ্রধান খাদ্যও কিছুই নয়, ও-সব মানুষে বানিয়েছে, ঐ সব খেয়েই যত রোগ। শর্করা-উৎপাদক (starchy) খাবার রোগের ঘর। ঘোড়া গরুকে পর্যন্ত ঘরে বসে চাল গম খাওয়ালে রোগী হয়ে যায়, আবার মাঠে ছেড়ে দিলে কচি ঘাস খেয়ে তাদের রোগ সেরে যায়। ঘাস শাক পাতা প্রভৃতি হরিৎ সব্জিতে শর্করা-উৎপাদক পদার্থ বড্ড কম।বনমানুষ জাতি বাদাম ও ঘাস খায়, আলু, গম ইত্যাদি খায় না; যদি খায় তো অপক্ব অবস্থায় যখন স্টার্চ (starch) অধিক হয়নি। এই সমস্ত নানাপ্রকার বিতণ্ডা চলছে। এক পক্ষ বলছেন, শূল্য মাংস আর যথেষ্ট ফল এবং দুগ্ধ—এইমাত্র ভোজনই দীর্ঘ জীবনের উপযোগী। বিশেষ ফল ফলাহারী অনেক দিন পর্যন্ত যুবা থাকবে, কারণ ফলের খাট্টা হাড়-গোড়ে জং ধরতে দেয় না।

এখন সর্ববাদিসম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয়, এমন খাওয়া দাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। সে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে তাকে হজম করতে; যদি হজমেই সমস্ত শক্তিটুকু গেল, বাকী আর কি কাজ করবার শক্তি রইল?

ভাজা জিনিষগুলো আসল বিষ। ময়রার দোকান যমের বাড়ী। ঘি তেল গরম দেশে যত অল্প খাওয়া যায়, ততই কল্যাণ। ঘিয়ের চেয়ে মাখন শীঘ্র হজম হয়। ময়দায় কিছুই নাই, দেখতেই সাদা। গরমে সমস্ত ভাগ যাতে আছে, এমন আটাই সুখাদ্য। আমাদের বাঙলা দেশের জন্য এখনও দূর পল্লীগ্রামে যে সকল আহারের বন্দোবস্ত আছে, তাই প্রশস্ত। কোন্ প্রাচীন বাঙালী কবি লুচি-কচুরির বর্ণনা করছেন? ও লুচি-কচুরি এসেছে পশ্চিম থেকে। সেখানেও কালেভদ্রে লোকে খায়। উপরি উপরি 'পাকি রসুই' খেয়ে থাকে এমন লোক তো দেখিনি! মথুরার চোবে কুস্তিগীর লুচি-লড্ডুকপ্রিয়; দু-চার বৎসরেই চোবের হজমের সর্বনাশ হয়, আর চোবেজী চূরণ খেয়ে খেয়ে মরেন।

গরীবরা খাবার জোটে না বলে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে অনাহারে মরে। যা তা পেটে পোরার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার দোকানের খাবারের খাদ্যদ্রব্যে কিছুই নেই, একদম উল্টো আছেন বিষ—বিষ—বিষ। পূর্বে লোকে কালেভদ্রে ঐ পাপগুলো খেত; এখন শহরের লোক, বিশেষ বিদেশী যারা শহরে বাস করে, তাদের নিত্য ভোজন হচ্ছে ঐ। এতে অজীর্ণরোগে অপমৃত্যু হবে তায় কি বিচিত্র! খিদে পেলেও কচুরি জিলিপি খানায় ফেলে দিয়ে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাও—সস্তাও হবে, কিছু খাওয়ায় হবে। ভাত, ডাল, আটার রুটি, মাছ, শাক, দুধ যথেষ্ট খাদ্য। তবে ডাল দক্ষিণীদের মত খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোলমাত্র, বাকীটা গরুকে দিও। মাংস খাবার পয়সা থাকে, খাও; তবে ও পশ্চিমী নানাপ্রকার গরম মসলাগুলো বাদ দিয়ে। মসলাগুলো খাওয়া নয়—ওগুলো অভ্যাসের দোষ। ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য। কচি কলাইশুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদ; প্যারিস রাজধানীর ঐ সূপ একটি বিখ্যাত খাওয়া। কচি কলাইশুঁটি খুব সিদ্ধ করে, তারপর তাকে পিষে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেল। তারপর একটা দুধছাঁকনির মত তারের ছাঁকনিতে ছাঁকলেই খোসাগুলো বেরিয়ে আসবে। এখন হলুদ ধনে জিরে মরিচ লঙ্কা, যা দেবার দিয়ে সাঁতলে নাও—উত্তম সুস্বাদ সুপাচ্য ডাল হল। যদি একটা পাঁঠার মুড়ি বা মাছের মুড়ি তার সঙ্গে থাকে তো উপাদেয় হয়।

ঐ যে এত প্রস্রাবের রোগের ধুম দেশে, ওর অধিকাংশই অজীর্ণ, দু-চার জনের মাথা ঘামিয়ে, বাকী সব বদহজম। পেটে পুরলেই কি খাওয়া হল? যেটুকু হজম হবে, সেইটুকুই খাওয়া। ভুঁড়ি নাবা বদহজমের প্রথম চিহ্ন। শুকিয়ে যাওয়া বা মোটা হওয়া দুটোই বদহজম। পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন (Albumen) দেখা দিয়েছে বলেই 'হাঁ' করে বস না। ও-সব আমাদের দেশের কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, অজীর্ণ না হতে পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁটো আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পার ছুটে নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থযাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই করে বদরিকাশ্রম যাওয়া-আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যারাম-ফ্যারাম ভূত ভাগবে। ডাক্তার-ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ—'ভাল করতে পারব না, মন্দ করব, কি দিবি তা বল্'। পারতপক্ষে ওষুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনর আনা! পার যদি প্রতি বৎসর পূজার বন্ধের সময় হেঁটে দেশে যাও। ধন [ধনী] হওয়া, আর কুড়ের বাদশা হওয়া—দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধরে হাঁটাতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা জীবন্ত রোগী, সেটা তো হতভাগা। যেটা লুচির ফুলকো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা তো মরে আছে। যে একদমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো? সেধে রোগ অকালমৃত্যু ডেকে আনলে কে কি করবে?

আবার ঐ যে পাঁউরুটি, উনিও হচ্ছেন বিষ, ওঁকে ছুঁয়ো না একদম। খাম্বীর মিশলেই ময়দা এক থেকে আর হয়ে দাঁড়ান। কোন খাম্বীরদার জিনিষ খাবে না, এ বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যে সর্বপ্রকার খাম্বীরদার জিনিষের নিষেধ আছে, এ বড় সত্য। শাস্ত্রে যে-কোন জিনিষ মিষ্টি থেকে টকেছে, তার নাম 'শুক্ত'; তা খেতে নিষেধ—কেবল দই ছাড়া। দই অতি উপাদেয়—উত্তম জিনিষ। যদি একান্ত পাঁউরুটি খেতে হয় তো তাকে পুনর্বার খুব আগুনে সেঁকে খাও।

অশুদ্ধ জল আর অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ। আমেরিকায় এখন জলশুদ্ধির বড়ই ধুম। এখন ঐ যে ফিলটার, ওর দিন গেছে চুকে। অর্থাৎ ফিলটার জলকে ছেঁকে দেয় মাত্র, কিন্তু

রোগের বীজ যে সকল কীটাণু তাতে থাকে, ওলাউঠা প্লেগের বীজ তা যেমন তেমনি থাকে; অধিকন্তু ফিলটারটি স্বয়ং ঐ সকল বীজের জন্মভূমি হয়ে দাঁড়ান। কলকেতায় যখন প্রথম ফিলটারকরা জল হল, তখন পাঁচ বৎসর নাকি ওলাউঠা হয় নাই; তারপর যে কে সেই, অর্থাৎ সে ফিলটার মশাই এখন স্বয়ং ওলাউঠা বীজের আবাস হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। ফিলটারের মধ্যে দিশী তেকাঠার ওপর ঐ যে তিন-কলসীর ফিলটার উনিই উত্তম, তবে দু-তিন দিন অন্তর বালি বা কয়লা বদলে দিতে হবে বা পুড়িয়ে নিতে হবে। আর ঐ যে একটু ফটকিরি দেওয়া—গঙ্গাতীরস্থ গ্রামের অভ্যাস, ঐটি সকলের চেয়ে ভাল। ফটকিরির গুঁড়ো যথাসম্ভব মাটি ময়লা ও রোগের বীজ সঙ্গে নিয়ে আস্তে আস্তে তলিয়ে যান। গঙ্গাজল জালায় পুরে একটু ফটকিরির গুঁড়ো দিয়ে থিতিয়ে যে আমরা ব্যবহার করি, ও তোমার বিলিতী ফিলটার-মিলটারের চোদ্দপুরুষের মাথায় ঝাঁটা মারে, কলের জলের দুশো বাপান্ত করে। তবে জল ফুটিয়ে নিতে পারলে নির্ভয় হয় বটে। ফটকিরি-থিতোন জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে ব্যবহার কর, ফিলটার-মিলটার খানায় ফেলে দাও। এখন আমেরিকায় বড় বড় যন্ত্রযোগে জলকে একদম বাষ্প করে দেয়, আবার সেই বাষ্পকে জল করে; তারপর আর একটা যন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু তার মধ্যে পুরে দেয়, যে বায়ুটা বাষ্প হবার সময় বেরিয়ে যায় [তার পরিবর্তে]। সে জল অতি বিশুদ্ধ; ঘরে ঘরে এখন দেখছি তাই।

যার দু-পয়সা আছে আমাদের দেশে, সে ছেলেপিলেগুলোকে নিত্য কচুরি মণ্ডা মেঠাই খাওয়াবে!! ভাত রুটি খাওয়া অপমান!! এতে ছেলেপিলেগুলো নড়ে-ভোলা পেটমোটা আসল জানোয়ার হবে না তো কি? এত বড় ষণ্ডা জাত ইংরেজ, এরা ভাজাভুজি মেঠাইমণ্ডার নামে ভয় খায়, যাদের বরফান দেশে বাস, দিনরাত কসরত! আর আমাদের অগ্নিকুণ্ডে বাস, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে নড়ে বসতে চাইনি, আর আহার লুচি কচুরি মেঠাই—ঘিয়েভাজা, তেলেভাজা!! সেকেলে পাড়াগেঁয়ে জমিদার এক কথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিত, দুকড়ি কই মাছ কাঁটাসুদ্ধ চিবিয়ে ছাড়ত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের ছেলেপিলেগুলো কলকেতায় আসে, চশমা চোখে দেয়, লুচি কচুরি খায়, দিনরাত গাড়ী চড়ে, আর প্রসাবের ব্যামো হয়ে মরে; 'কলকেত্তা'ই হওয়ার এই ফল!! আর সর্বনাশ

করেছে ঐ পোড়া ডাক্তার- বদ্দিগুলো। ওরা সবজান্তা, ওষুধের জোরে ওরা সব করতে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে তো অমনি একটু ওষুধ দাও; পোড়া বদ্দিও বলে না যে, দূর কর্ ওষুধ, যা, দুক্রোশ হেঁটে আস্‌গে যা। নানান্ দেশ দেখছি, নানান্ রকমের খাওয়াও দেখছি। তবে আমাদের ভাত-ডাল ঝোল-চচ্চড়ি শুক্তো মোচার ঘণ্টের জন্য পুনর্জন্ম নেওয়াও বড় বেশী কথা মনে হয় না। দাঁত থাকতে তোমরা যে দাঁতের মর্যাদা বুঝছ না, এই আপসোস। খাবার নকল কি ইংরেজের করতে হবে—সে টাকা কোথায়? এখন আমাদের দেশের উপযোগী যথার্থ বাঙালী খাওয়া, উপাদেয় পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব-বাঙলায়, ওদের নকল কর যত পার। যত পশ্চিমের দিকে ঝুঁকবে, ততই খারাপ; শেষ কলাইয়ের ডাল আর মাছের টক মাত্র—আধা-সাঁওতালী বীরভূম বাঁকড়োয় দাঁড়াবে!! তোমরা কলকেতার লোক, ঐ যে এক সর্বনেশে ময়দার তালে হাতে-মাটি দেওয়া ময়রার দোকানরূপ সর্বনেশে ফাঁদ খুলে বসেছে, ওর মোহিনীতে বীরভূম বাঁকড়ো ধামাপ্রমাণ মুড়ি দামোদরে ফেলে দিয়েছে, কলায়ের ডাল গেছেন খানায়, আর পোস্তবাটা দেওয়ালে লেপ দিয়েছে, ঢাকা বিক্রমপুরও ঢাঁইমাছ কচ্ছপাদি জলে ছেড়ে দিয়ে 'সইভ্য' হচ্ছে!! নিজেরা তো উৎসন্ন গেছ, আবার দেশসুদ্ধকে দিচ্ছ, এই তোমরা বড্ড সভ্য, শহুরে লোক! তোমাদের মুখে ছাই! ওরাও এমনি আহাম্মক যে, ঐ কলকেতার আবর্জনাগুলো খেয়ে উদরাময় হয়ে মর-মর হবে, তবু বলবে না যে, এগুলো হজম হচ্ছে না, বলবে—নোনা লেগেছে!! কোন রকম করে শহুরে হবে!!

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তো এই মোট কথা শুনলে। এখন পাশ্চাত্যরা কি খায় এবং তাদের আহারের ক্রমশঃ কেমন পরিবর্তন হয়েছে, তাও কিছু বলি।

গরীব অবস্থায় সকল দেশের খাওয়াই ধান্যবিশেষ; এবং শাক-তরকারি মাছ-মাংস বিলাসের মধ্যে এবং চাটনির মত ব্যবহৃত হয়। যে দেশে যে শস্য প্রধান ফসল, গরীবের প্রধান খাওয়া তাই; অন্যান্য জিনিষ আনুষঙ্গিক। যেমন বাঙলা ও উড়িষ্যায়, মান্দ্রাজ উপকূলে ও মালাবার উপকূলে ভাত প্রধান খাদ্য; তার সঙ্গে ডাল তরকারি, কখনও কখনও মাছ মাংস চাটনিবৎ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য সর্বদেশে অবস্থাপন্ন লোকের জন্য গমের রুটি ও ভাত; সাধারণ লোকের নানাপ্রকার বজরা, মড়ুয়া, জনার, ঝিঙ্গোরা প্রভৃতি ধান্যের রুটি প্রধান খাদ্য।

শাক, তরকারি, ডাল, মাছ, মাংস, সমস্তেরই—সমগ্র ভারতবর্ষে ঐ রুটি বা ভাতকে সুস্বাদ করবার জন্য ব্যবহার, তাই ওদের নাম ব্যঞ্জন। এমন কি পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্য দেশে অবস্থাপন্ন আমিষাশী লোকেরা—এমন কি রাজারাও—যদিও নিত্য নানাপ্রকার মাংস ভোজন করেন, তথাপি রুটি বা ভাতই প্রধান খাদ্য। যে ব্যক্তি আধ সের মাংস নিত্য খায়, সে এক সের রুটি তার সঙ্গে নিশ্চিত খায়।

পাশ্চাত্যদেশে এখন যে সকল গরীব দেশ আছে [তাদের] এবং ধনী দেশের গরীবদের মধ্যে ঐ প্রকার রুটি এবং আলুই প্রধান খাদ্য; মাংসের চাটনি মাত্র—তাও কালেভদ্রে। স্পেন, পোর্তুগাল, ইতালী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণদেশে যথেষ্ট দ্রাক্ষা জন্মায় এবং দ্রাক্ষা-ওয়াইন অতি সস্তা। সে সকল ওয়াইনে মাদকতা নাই (অর্থাৎ পিপে-খানেক না খেলে তো আর নেশা হবে না এবং তা কেউ খেতে পারে না) এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। সে দেশের দরিদ্র লোকে এজন্য মাছ-মাংসের জায়গায় ঐ দ্রাক্ষারস দ্বারা পুষ্টি সংগ্রহ করে। কিন্তু উত্তরাঞ্চল—যেমন রুশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে দরিদ্র লোকের আহার প্রধানতঃ রাই-নামক ধান্যের রুটি ও এক-আধ টুকরো সুঁটকি মাছ ও আলু।

ইওরোপের অবস্থাপন্ন লোকের এবং আমেরিকার আবালবৃদ্ধবনিতার খাওয়া আর এক রকম—অর্থাৎ রুটি ভাত প্রভৃতি চাটনি এবং মাছ-মাংসই হচ্ছে খাওয়া। আমেরিকায় রুটি-খাওয়া নাই বললেই হয়। মাছ মাছই এল, মাংস মাংসই এল, তাকে অমনি খেতে হবে, ভাত-রুটির সংযোগে নয়। এবং এজন্য প্রত্যেক বারেই থালা বদলান হয়। যদি দশটা খাবার জিনিষ থাকে তো দশবার থালা বদলাতে হয়। যেমন মনে কর, আমাদের দেশে প্রথমে শুধু শুক্তো এল, তারপর থালা বদলে শুধু ডাল এল, আবার থালা বদলে শুধু ঝোল এল, আবার থালা বদলে দুটি ভাত, নয় তো দুখান লুচি ইত্যাদি। এর লাভের মধ্যে এই যে, নানা জিনিষ অল্প অল্প খাওয়া হয়, পেট বোঝাই করা হয় না।

ফরাসী চাল–সকালবেলা ‘কফি’ এবং এক-আধ টুকরো রুটি-মাখম; দুপুরবেলা মাছ মাংস ইত্যাদি মধ্যবিৎ; রাত্রে লম্বা খাওয়া। ইতালী, স্পেন প্রভৃতি জাতিদের ঐ এক রকম; জার্মানরা ক্রমাগতই খাচ্ছে–পাঁচ বার, ছ-বার, প্রত্যেক বারেই অল্পবিস্তর মাংস। ইংরেজরা তিনবার–সকালে অল্প, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কফি-যোগ, চা-যোগ আছে। আমেরিকানদের তিনবার–উত্তম ভোজন, মাংস প্রচুর।

তবে এ সকল দেশেই ‘ডিনার’টা প্রধান খাদ্য–ধনী হলে তার ফরাসী রাঁধুনী এবং ফরাসী চাল। প্রথমে একটু আধটু নোনা মাছ বা মাছের ডিম, বা কোন চাটনি বা সবজি। এটা হচ্ছে ক্ষুধাবৃদ্ধি। তারপর সূপ, তারপর আজকাল ফ্যাশন–একটা ফল, তারপর মাছ, তারপর মাংসের একটা তরকারি, তারপর থান-মাংস শূল্য, সঙ্গে কাঁচা সবজি; তারপর আরণ্য মাংস মৃগপক্ষ্যাদি, তারপর মিষ্টান্ন, শেষ কুলপি–‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’। ধনী হলে প্রায় প্রত্যেক বার থাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মদ বদলাচ্ছে–শেরি, ক্ল্যারেট, শ্যামপাঁ ইত্যাদি এবং মধ্যে মধ্যে মদের কুলপি একটু আধটু। থাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা-চামচ সব বদলাচ্ছে; আহারান্তে ‘কফি’–বিনা-দুগ্ধ, আসবমদ্য–খুদে খুদে গ্লাসে, এবং ধূমপান। খাওয়ার রকমারীর সঙ্গে মদের রকমারী দেখাতে পারলে তবে ‘বড়োমানুষি চাল’ বলবে। একটা খাওয়ায় আমাদের দেশের একটা মধ্যবিৎ লোক সর্বস্বান্ত হতে পারে, এমন খাওয়ার ধূম এরা করে।

আর্যরা একটা পীঠে বসত, একটা পীঠে ঠেসান দিত এবং জলচৌকির উপর থালা রেখে এক থালাতেই সকল খাওয়া খেত। ঐ চাল এখনও পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র ও গুর্জর দেশে বিদ্যমান। বাঙালী, উড়ে, তেলিঙ্গী, মালাবারী প্রভৃতি মাটিতেই ‘সাপড়ান’। মহীশূরের মহারাজও মাটিতে আঙট পাতে ভাত ডাল খান। মুসলমানেরা চাদর পেতে খায়। বর্মি, জাপানী প্রভৃতি উপু হয়ে বসে মাটিতে থাল রেখে খায়। চীনেরা টেবিলে খায়; চেয়ারে বসে, কাটি ও চামচ-যোগে খায়। রোমান ও গ্রীকরা কোচে শুয়ে টেবিলের ওপর থেকে হাত দিয়ে খেত। ইওরোপীরা টেবিলের ওপর হতে কেদারায় বসে–হাত দিয়ে পূর্বে খেত, এখন নানাপ্রকার কাঁটা-চামচ।

চীনের খাওয়াটা কসরত বটে–যেমন আমাদের পানওয়ালীরা দুখানা সম্পূর্ণ আলাদা লোহার পাতকে হাতের কায়দায় কাঁচির কাজ করায়, চীনেরা তেমনি দুটো কাটিকে ডান হাতের দুটো আঙুল আর মুঠোর কায়দায় চিমটের মত করে শাকাদি মুখে তোলে। আবার দুটোকে একত্র করে একবাটি ভাত মুখের কাছে এনে, ঐ কাটিদ্বয়নির্মিত খোন্তাযোগে ঠেলে ঠেলে মুখে পোরে।

সকল জাতিরই আদিম পুরুষ নাকি প্রথম অবস্থায় যা পেত তাই খেত। একটা জানোয়ার মারলে, সেটাকে এক মাস ধরে খেত; পচে উঠলেও তাকে ছাড়ত না। ক্রমে সভ্য হয়ে উঠল, চাষ বাস শিখলে; আরণ্য পশুকুলের মত একদিন বেদম খাওয়া, আর দু-পাঁচ দিন অনশন–ঘুচল; আহার নিত্য জুটতে লাগল; কিন্তু পচা জিনিষ খাবার চাল একটা দাঁড়িয়ে গেল। পচা দুর্গন্ধ একটা যা হয় কিছু, আবশ্যক ভোজ্য হতে নৈমিত্তিক আদরের চাটনি হয়ে দাঁড়াল।

এস্কুইমো জাতি বরফের মধ্যে বাস করে। শস্য সে দেশে একদম জন্মায় না; নিত্য ভোজন–মাছ মাংস; ১০।৫ দিনে অরুচি বোধ হলে একটুকরো পচা মাংস খায়– অরুচি সারে।

ইওরোপীরা এখনও বন্য পশু পক্ষীর মাংস না পচলে খায় না। তাজা পেলেও তাকে টাঙিয়ে রাখে–যতক্ষণ না পচে দুর্গন্ধ হয়। কলকেতায় পচা হরিণের মাংস পড়তে পায় না; রসা ভেটকির উপাদেয়তা প্রসিদ্ধ। ইংরেজদের পনীর যত পচবে, যত পোকা কিলবিল করবে, ততই উপাদেয়। পলায়মান পনীর-কীটকেও তাড়া করে ধরে মুখে পুরবে–তা নাকি বড়ই সুস্বাদ!! নিরামিষাশী হয়েও প্যাঁজ-লশুনের জন্য ছোঁক ছোঁক করবে, দক্ষিণী বামুনের প্যাঁজ-লশুন নইলে খাওয়াই হবে না। শাস্ত্রকারেরা সে পথও বন্ধ করে দিলেন। প্যাঁজ, লশুন, গেঁয়ো শোর, গেঁয়ো মুরগী খাওয়া এক জাতের [পক্ষে] পাপ, সাজা–জাতিনাশ। যারা শুনলে এ কথা তারা ভয়ে প্যাঁজ-লশুন ছাড়লে, কিন্তু তার চেয়ে বিষমদুর্গন্ধ হিং খেতে আরম্ভ করলে! পাহাড়ী গোঁড়া হিঁদু লশুনে-ঘাস প্যাঁজ-লশুনের জায়গায় ধরলে। ও-দুটোর নিষেধ তো আর পুঁথিতে নেই!!

সকল ধর্মেই খাওয়া-দাওয়ার একটা বিধি-নিষেধ আছে; নাই কেবল ক্রিশ্চানী ধর্মে। জৈন-বৌদ্ধয় মাছ মাংস খাবেই না। জৈন আবার যা মাটির নীচে জন্মায়, আলু মূলো প্রভৃতি—তাও খাবে না; খুঁড়তে গেলে পোকা মরবে, রাত্রে খাবে না—অন্ধকারে পাছে পোকা খায়।

য়াহুদীরা যে মাছে আঁশ নেই তা খাবে না, শোর খাবে না, যে জানোয়ার দ্বিশফ১৩ নয় এবং জাবর কাটে না, তাকেও খাবে না। আবার বিষম কথা, দুধ বা দুগ্ধোৎপন্ন কোন জিনিষ যদি হেঁশেলে ঢোকে যখন মাছ মাংস রান্না হচ্ছে, তো সে সব ফেলে দিতে হবে। এ বিধায় গোঁড়া য়াহুদী অন্য কোন জাতির রান্না খায় না। আবার হিঁদুর মত য়াহুদীরা বৃথা-মাংস১৪ খায় না। যেমন বাঙলা দেশে ও পাঞ্জাবে মাংসের নাম 'মহাপ্রসাদ'। য়াহুদীরা সেই প্রকার 'মহাপ্রসাদ' অর্থাৎ যথানিয়মে বলিদান না হলে মাংস খায় না। কাজেই হিঁদুর মত য়াহুদীদেরও যে-সে দোকান হতে মাংস কেনবার অধিকার নেই। মুসলমানরা য়াহুদীদের অনেক নিয়ম মানে, তবে অত বাড়াবাড়ি করে না; দুধ, মাছ, মাংস একসঙ্গে খায় না এইমাত্র, ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই যে সর্বনাশ, অত মানে না। য়াহুদীদের আর হিঁদুদের অনেক সৌসাদৃশ্য—খাওয়া সম্বন্ধে; তবে য়াহুদীরা বুনো শোরও খায় না, হিঁদুরা খায়। পাঞ্জাবে মুসলমান-হিঁদুর বিষম সংঘাত থাকায়, বুনো শোর আবার হিঁদুদের একটা অত্যাবশ্যক খাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজপুতদের মধ্যে বুনো শোর শিকার করে খাওয়া একটা ধর্মবিশেষ। দক্ষিণ-দেশে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতের মধ্যে গেঁয়ো শোরও যথেষ্ট চলে। হিঁদুরা বুনো মুরগী খায়, গেঁয়ো খায় না। বাঙলা দেশ থেকে নেপাল ও আকাশ্মীর হিমালয়—এক রকম চালে চলে। মনূক্ত খাওয়ার প্রথা এই অঞ্চলে সমধিক বিদ্যমান আজও।

কিন্তু কুমায়ুন হতে আরম্ভ করে কাশ্মীর পর্যন্ত—বাঙালী, বেহারী, প্রয়াগী ও নেপালীর চেয়েও মনুর আইনের বিশেষ প্রচার। যেমন বাঙালী মুরগী বা মুরগীর ডিম খায় না, কিন্তু হাঁসের ডিম খায়, নেপালীও তাই; কিন্তু কুমায়ুন হতে তাও চলে না। কাশ্মীরীরা বুনো হাঁসের ডিম পেলে সুখে খায়, গ্রাম্য নয়।

এলাহাবাদের পর হতে, হিমালয় ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত দেশে–যে ছাগল খায়, সে মুরগীও খায়।

এই সকল বিধি-নিষেধের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বাস্থ্যের জন্য, তার সন্দেহ নেই। তবে সকল জায়গায় সমান পারে না। শোর মুরগী যা তা খায়, অতি অপরিষ্কার জানোয়ার, কাজেই নিষেধ; বুনো জানোয়ার কি খায় কে দেখতে যায় বল। তা ছাড়া রোগ–বুনো জানোয়ারের কম!

দুধ–পেটে অম্লাধিক্য হলে একেবারে দুষ্পাচ্য, এমন কি একদমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে কখনও কখনও সদ্য মৃত্যু ঘটেছে। দুধ–যেমন শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেমনি ঢোকে ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরী লাগে। দুধ একটা গুরুপাক জিনিষ, মাংসের সঙ্গে হজম আরও গুরুপাক, কাজেই এ নিষেধ য়াহুদীদের মধ্যে। মূর্খ মাতা কচি ছেলেকে জোর করে ঢক ঢক করে দুধ খাওয়ায়, আর দু-ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে!! এখনকার ডাক্তারেরা পূর্ণবয়স্কদের জন্যও এক পোয়া দুধ আস্তে আস্তে আধ ঘণ্টায় খাওয়ার বিধি দেন; কচি ছেলেদের জন্য 'ফিডিং বটল্' ছাড়া উপায়ান্তর নেই। মা ব্যস্ত কাজে–দাসী একটা ঝিনুকে করে ছেলেটাকে চেপে ধরে সাঁ সাঁ দুধ খাওয়াচ্ছে!! লাভের মধ্যে এই যে, রোগা-পটকাগুলো আর বড় 'বড়' হচ্ছে না, তারা ঐখানেই জন্মের শোধ দুধ খাচ্ছে; আর যেগুলো এ বিষম খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে ঠেলে ঠুলে উঠছে, সেগুলো প্রায় সুস্থকায় এবং বলিষ্ঠ।

সেকেলে আঁতুড় ঘর, দুধ খাওয়ানো প্রভৃতির হাত থেকে যে ছেলেপিলেগুলো বেঁচে উঠত, সেগুলো এক রকম সুস্থ সবল আজীবন থাকত! মা ষষ্ঠীর সাক্ষাৎ বরপুত্র না হলে কি আর সেকালে একটা ছেঁলে বাঁচত!! সে তাপসেঁক, দাগাফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা, প্রসূতি ও প্রসূত–উভয়েরই পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। হরিল্লুঠের তুলসীতলার খোকা ও মা–দুই প্রায় বেঁচে যেত, সাক্ষাৎ যমরাজের দূত চিকিৎসকদের হাত এড়াত বলে।

৮. বেশভূষা

সকল দেশেই কাপড়ে চোপড়ে কিছু না কিছু ভদ্রতা লেগে থাকে। 'ব্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুঝবো ক্যামনে?' শুধু ব্যাতনে নয়, 'কাপড় না দেখলে ভদ্র অভদ্র বুঝবো ক্যামনে' সর্বদেশে কিছু না কিছু চলন। আমাদের দেশে শুধু গায়ে ভদ্রলোক রাস্তায় বেরুতে পারে না, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আবার পাগড়ি মাথায় না দিয়ে কেউই রাস্তায় বেরোয় না। পাশ্চাত্য দেশে ফরাসীরা বরাবর সকল বিষয়ে অগ্রণী—তাদের খাওয়া, তাদের পোষাক সকলে নকল করে। এখনও ইওরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ পোষাক বিদ্যমান; কিন্তু ভদ্র হলেই, দুপয়সা হলেই অমনি সে পোষাক অন্তর্ধান হন, আর ফরাসী পোষাকের আবির্ভাব। কাবুলী পাজামা-পরা ওলন্দাজী চাষা, ঘাগরা-পরা গ্রীক, তিব্বতী-পোষাক-পরা রুশ যেমন 'বোদ্র' হয়, অমনি ফরাসী কোট প্যাণ্টালুনে আবৃত হয়। মেয়েদের তো কথাই নেই, তাদের পয়সা হয়েছে কি, পারি রাজধানীর পোষাক পরতে হবেই হবে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী এখন ধনী জাত; ও-সব দেশে সকলেরই একরকম পোষাক—সেই ফরাসী নকল। তবে আজকাল পারি অপেক্ষা লণ্ডনে পুরুষদের পোষাক ভব্যতর, তাই পুরুষদের পোষাক 'লণ্ডন মেড' আর মেয়েদের পারিসিয়েন নকল। যাদের বেশী পয়সা, তারা ঐ দুই স্থান হতে তৈয়ারী পোষাক বারমাস ব্যবহার করে। আমেরিকা বিদেশী আমদানী পোষাকের উপর ভয়ানক মাসুল বসায়, সে মাসুল দিয়েও পারি-লণ্ডনের পোষাক পরতে হবে। এ কাজ একা আমেরিকানরা পারে—আমেরিকা এখন কুবেরের প্রধান আড্ডা!

প্রাচীন আর্যজাতিরা ধুতি-চাদর পরত; ক্ষত্রিয়দের ইজার ও লম্বা জামা—লড়ায়ের সময়। অন্য সময় সকলেরই ধুতি-চাদর। কিন্তু পাগড়িটা ছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মেয়ে-মদ্দে পাগড়ি পড়ত। এখন যেমন বাঙলা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কপনি-মাত্র থাকলেই শরীর ঢাকার কাজ হল, কিন্তু পাগড়িটা চাই; প্রাচীনকালেও তাই ছিল—মেয়ে-মদ্দে। বৌদ্ধদের সময়ের যেসকল ভাস্কর্যমূর্তি পাওয়া যায়, তারা মেয়ে-মদ্দে কৌপীন-

পরা। বুদ্ধদেবের বাপ কপনি পরে বসেছেন সিংহাসনে; তদ্বৎ মাও বসেছেন—বাড়ার ভাগ, এক-পা মল ও এক-হাত বালা; কিন্তু পাগড়ি আছে!! সম্রাট্ ধর্মাশোক ধুতি পরে, চাদর গলায় ফেলে, আদুড় গায়ে একটা ডমরু-আকার আসনে বসে নাচ দেখছেন! নর্তকীরা দিব্যি উলঙ্গ; কোমর থেকে কতকগুলো ন্যাকড়ার ফালি ঝুলছে। মোদ্দা পাগড়ি আছে। নেবু টেবু সব ঐ পাগড়িতে। তবে রাজসামন্তরা ইজার ও লম্বা জামা পরা—চোস্ত ইজার ও চোগা। সারথি নলরাজ এমন রথ চালালেন যে, রাজা ঋতুপর্ণের চাদর কোথায় পড়ে রইল; রাজা ঋতুপর্ণ আদুড় গায়ে বে করতে চললেন। ধুতি-চাদর আর্যদের চিরন্তন পোষাক, এইজন্যই ক্রিয়াকর্মের বেলায় ধুতি-চাদর পরতেই হয়।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের পোষাক ছিল ধুতি-চাদর; একখান বৃহৎ কাপড় ও চাদর—নাম 'তোগা', তারি অপভ্রংশ এই 'চোগা'। তবে কখনও কখনও একটা পিরানও পরা হত। যুদ্ধকালে ইজার জামা। মেয়েদের একটা খুব লম্বাচৌড়া চারকোণা জামা, যেমন দুখানা বিছানার চাদর লম্বালম্বি সেলাই করা, চওড়ার দিক্ খোলা। তার মধ্যে ঢুকে কোমরটা বাঁধলে দুবার—একবার বুকের নীচে, একবার পেটের নীচে। তারপর উপরের খোলা দুপাট দুহাতের উপর দু জায়গায় তুলে মোটা ছুঁচ দিয়ে আটকে দিলে যেমন—উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ীরা কম্বল পরে। সে পোষাক অতি সুন্দর ও সহজ। ওপরে একখান চাদর।

কাটা কাপড় এক ইরানীরা প্রাচীনকাল হতে পরত। বোধ হয় চীনেদের কাছে শেখে। চীনেরা হচ্ছে সভ্যতার অর্থাৎ ভোগবিলাসের সুখস্বচ্ছন্দতার আদিগুরু। অনাদিকাল হতে চীনে টেবিলে খায়, চেয়ারে বসে যন্ত্র তন্ত্র কত খাওয়ার জন্য, এবং কাটা পোষাক নানা রকম, ইজার-জামা টুপিটাপা পরে।

সিকন্দর শা ইরান জয় করে, ধুতি-চাদর ফেলে ইজার পরতে লাগলেন। তাতে তাঁর স্বদেশী সৈন্যরা এমন চটে গেল যে বিদ্রোহ হবার মত হয়েছিল। মোদ্দা সিকন্দর নাছাড় পুরুষ—ইজার-জামা চালিয়ে দিলেন।

গরমদেশে কাপড়ের দরকার হয় না। কৌপীনমাত্রেই লজ্জানিবারণ, বাকী কেবল অলঙ্কার। ঠাণ্ডা দেশে শীতের চোটে অস্থির, অসভ্য অবস্থায় জানোয়ারের ছাল টেনে পরে, ক্রমে কম্বল পরে, ক্রমে জামা-পাজামা ইত্যাদি নানানখানা হয়। তারপর আদুড় গায়ে গয়না পরতে গেলেই তো ঠাণ্ডায় মৃত্যু, কাজেই অলঙ্কার-প্রিয়তাটা ঐ কাপড়ের উপর গিয়ে পড়ে। যেমন আমাদের দেশে গয়নার ফ্যাশন বদলায়, এদের তেমনি ঘড়ি ঘড়ি বদলাচ্ছে কাপড়ের ফ্যাশন।

ঠাণ্ডা দেশমাত্রেই এজন্য সর্বদা সর্বাঙ্গ না ঢেকে কারু সামনে বেরুবার যো নেই। বিলেতে ঠিক ঠিক পোষাকটি না পরে ঘরের বাইরে যাবার যো নেই। পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের পা দেখান বড়ই লজ্জা, কিন্তু গলা ও বুকের খানিকটা দেখান যেতে পারে। আমাদের দেশে মুখ দেখান বড়ই লজ্জা; কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে শাড়ী কোমরে ওঠেন উঠুন, তায় দোষ নেই। রাজপুতানার ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখানো!

পাশ্চাত্য দেশের নর্তকী ও বেশ্যারা লোক ভুলাবার জন্য অনাচ্ছিদিত। এদের নাচের মানে, তালে তালে শরীর অনাবৃত করে দেখানো। আমাদের দেশের আদুড় গা ভদ্রলোকের মেয়ের; নর্তকী বেশ্যা সর্বাঙ্গ ঢাকা। পাশ্চাত্য দেশে মেয়ে ছেলে সর্বদাই গা ঢাকা, গা আদুড় করলে আকর্ষণ বেশী হয়; আমাদের দেশে দিনরাত আদুড় গা, পোষাক পরে ঢেকেঢুকে থাকলেই আকর্ষণ অধিক। মালাবার দেশে মেয়ে-মদ্দের কৌপীনের উপর বহির্বাসমাত্র, আর বস্ত্রমাত্রই নেই। বাঙালীরও তাই, তবে কৌপীন নাই এবং পুরুষদের সাক্ষাতে মেয়েরা গা-টা মুড়ি-ঝুড়ি দিয়ে ঢাকে।

পাশ্চাত্য দেশে পুরুষে পুরুষে সর্বাঙ্গ অক্লেশে উলঙ্গ হয়—আমাদের মেয়েদের মত। বাপ-ছেলেয় সর্বাঙ্গ উলঙ্গ করে স্নানাদি করে, দোষ নেই। কিন্তু মেয়েদের সামনে, বা রাস্তা-ঘাটে, বা নিজের ঘর ছাড়া—সর্বাঙ্গ ঢাকা চাই।

এক চীনে ছাড়া সর্বদেশেই এ লজ্জা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বিষয় দেখছি—কোন বিষয়ে বেজায় লজ্জা, আবার তদপেক্ষা অধিক লজ্জাকর বিষয়ে আদতে লজ্জা নেই। চীনে মেয়ে-

মদ্দে সর্বদা আপাদমস্তক ঢাকা। চীনে কনফুছের চেলা, বুদ্ধের চেলা, বড় নীতি-দুরস্ত; খারাপ কথা, চাল, চলন—তৎক্ষণাৎ সাজা। ক্রিশ্চান পাদ্রী গিয়ে চীনে ভাষায় বাইবেল ছাপিয়ে ফেললে। এখন বাইবেল-পুরাণ হচ্ছেন হিঁদুর পুরাণের চোদ্দ পুরুষ—সে দেবতা-মানুষের অদ্ভুত কেলেঙ্কার পড়ে চীনে তো চটে অস্থির। বললে, 'এই বই কিছুতেই এ দেশে চালানো হবে না, এ তো অতি অশ্লীল কেতাব'; তার উপর পাদ্রিনী বুকখোলা সান্ধ্য পোষাক পরে, পর্দার বার হয়ে চীনেদের নিমন্ত্রণে আহ্বান করলেন। চীনে মোটাবুদ্ধি, বললে—'সর্বনাশ! এই খারাপ বই পড়িয়ে, আর এই মাগীদের আদুড় গা দেখিয়ে, আমাদের ছোঁড়া বইয়ে দিতে এ ধর্ম এসেছে।' এই হচ্ছে চীনের ক্রিশ্চানের উপর মহাক্রোধ। নতুবা চীনে কোন ধর্মের উপর আঘাত করে না। শুনছি যে, পাদ্রীরা এখন অশ্লীল অংশ ত্যাগ করে বাইবেল ছাপিয়েছে; কিন্তু চীনে তাতে আরও সন্দিহান।

আবার এ পাশ্চাত্য দেশে দেশবিশেষে লজ্জাঘেন্নার তারতম্য আছে। ইংরেজ ও আমেরিকানের লজ্জা-শরম একরকম; ফরাসীর আর একরকম; জার্মানের আর একরকম। রুশ আর তিব্বতী বড় কাছাকাছি; তুরস্কের আর এক ডোল; ইত্যাদি।

৯. রীতিনীতি

আমাদের দেশের চেয়ে ইওরোপে ও আমেরিকায় মলমূত্রাদি ত্যাগে বড়ই লজ্জা। আমরা হচ্ছি নিরামিষভোজী—এক কাঁড়ি ঘাস পাতা আহার। আবার বেজায় গরম দেশ, এক দমে লোটা-ভর জল খাওয়া চাই। পশ্চিমী চাষা সেরভর ছাতু খেলে; তারপর পাতকোকে পাতকোই খালি করে ফেললে জল খাওযার চোটে। গরমিকালে আমরা বাঁশ [বাঁশের নল] বার করে দিই লোককে জল খাওয়াতে। কাজেই সে সব যায় কোথা, বল? দেশ বিষ্ঠামূত্রময় না হয়ে যায় কোথা? গরুর গোয়াল, ঘোড়ার আস্তাবল, আর বাঘ-সিঙ্গির পিঁজরার তুলনা কর দিকি!

কুকুর আর ছাগলের তুলনা কর দিকি! পাশ্চাত্যদেশের আহার মাংসময়, কাজেই অল্প; আর ঠাণ্ডা দেশে জল খাওয়া নেই বললেই হয়। ভদ্রলোকের খুদে খুদে গ্লাসে একটু মদ খাওয়া। ফরাসীরা জলকে বলে ব্যাঙের রস, তা কি খাওয়া চলে? এক আমেরিকান জল খায় কিছু বেশী, কারণ ওদের দেশ গরমিকালে ভয়ঙ্কর গরম, নিউ ইয়র্ক কলকেতার চেয়েও গরম। আর জার্মানরা বড্ড 'বিয়র' পান করে—কিন্তু সে খাবার সঙ্গে নয় বড়।

ঠাণ্ডা দেশে সর্দি লাগবার সদাই সম্ভাবনা; গরম দেশে খেতে বসে ঢক ঢক জল। এরা কাজেই না হেঁচে যায় কোথা, আর আমরা ঢেঁকুর না তুলেই বা যাই কোথা? এখন দেখ নিয়ম—এ দেশে খেতে বসে যদি ঢেঁকুর তুলেছ, তো সে বেয়াদবির আর পার নেই। কিন্তু রুমাল বার করে তাতে ভড় ভড় করে সিকনি ঝাড়ো, এদের তায় ঘেন্না হয় না। আমাদের ঢেঁকুর না তুললে নিমন্ত্রক খুশীই হন না; কিন্তু পাঁচ জনের সঙ্গে খেতে খেতে ভড় ভড় করে সিকনি ঝাড়াটা কেমন?

ইংলণ্ডে, আমেরিকায় মলমূত্রের নামটি আনবার যো নেই মেয়েদের সামনে। পায়খানায় যেতে হবে চুরি করে। পেট গরম হয়েছে, বা পেটের কোন প্রকার অসুখের কথা মেয়েদের

সামনে বলবার যো নেই, অবশ্য বুড়ী-টুড়ি আলাপী আলাদা কথা। মেয়েরা মলমূত্র চেপে মরে যাবে, তবুও পুরুষের সামনে ও-নামটিও আনবে না।

ফরাসী দেশে অত নয়। মেয়েদের মলমূত্রের স্থানের পাশেই পুরুষদের; এরা এ-দোর দিয়ে যাচ্ছে, ওরা ও-দোর দিয়ে যাচ্ছে; অনেক স্থানে এক দোর, ঘর আলাদা। রাস্তার দু ধারে মাঝে মাঝে প্রসাবের স্থান, তা খালি পিঠটা ঢাকা পড়ে মাত্র, মেয়েরা দেখছে, তায় লজ্জা নাই—আমাদের মত। অবশ্য মেয়েরা অমন অনাবৃত স্থানে যায় না। জার্মানদের আরও কম।

ইংরেজ ও আমেরিকানরা কথাবার্তায়ও বড় সাবধান, মেয়েদের সামনে। সে 'ঠ্যাঙ' বলবার পর্যন্ত যো নেই। ফরাসীরা আমাদের মত মুখখোলা; জার্মান রুশ প্রভৃতি সকলের সামনে খিস্তি করে।

কিন্তু প্রেম-প্রণয়ের কথা অবাধে মায় ছেলে, ভায়ে বোনে বাপে—তা চলেছে। বাপ মেয়ের প্রণয়ীর (ভবিষ্যৎ বরের) কথা নানা রকম ঠাট্টা করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করছে। ফরাসীর মেয়ে তায় অবনতমুখী, ইংরেজের মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিনের মেয়ে চোটপাট জবাব দিচ্ছে। চুম্বন, আলিঙ্গনটা পর্যন্ত দোষাবহ নয়, অশ্লীল নয়। সে সব কথা কওয়া চলে। আমেরিকায় পরিবারের পুরুষবন্ধুও আত্মীয়তা হলে বাড়ীর যুবতী মেয়েদেরও শেকহ্যাণ্ডের স্থলে চুম্বন করে। আমাদের দেশে প্রেম-প্রণয়ের নামগন্ধটি পর্যন্ত গুরুজনের সামনে হবার যো নেই।

এদের অনেক টাকা। অতি পরিষ্কার এবং কেতাদুরস্ত কাপড় না পরলে সে ছোটলোক—তার সমাজে যাবার যো নেই। প্রত্যহ ধোপদস্ত কামিজ, কলার প্রভৃতি দুবার তিনবার বদলাতে হবে ভদ্রলোককে! গরীবরা অত শত পারে না; ওপরের কাপড়ে একটি দাগ, একটি কোঁচকা থাকলেই মুশকিল। নখের কোণে, হাতে, মুখে একটু ময়লা থাকলেই মুশকিল। গরমিতে পচেই মর আর যাই হোক, দস্তানা পরে যেতেই হবে, নইলে রাস্তায় হাত ময়লা হয় এবং সে হাত কোন স্ত্রীলোকের হাতে দিয়ে সম্ভাষণ করাটা অতি অভদ্রতা।

ভদ্রসমাজে থুথু ফেলা বা কুলকুচো করা বা দাঁত খোঁটা ইত্যাদি করলে তৎক্ষণাৎ চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তি!!

১০. পাশ্চাত্যে শক্তিপূজা

ধর্ম এদের শক্তিপূজা, আধা বামাচার রকমের; পঞ্চ মকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে। ‘ বামে বামা ... দক্ষিণে পানপাত্রং ... অগ্রে ন্যস্তং মরীচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসং ... কৌলো ধর্মঃ পরমগহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ’।১৫ প্রকাশ্য, সর্বসাধারণ, শক্তিপূজা বামাচার–মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেষ্টাণ্ট তো ইওরোপে নগণ্য–ধর্ম তো ক্যাথলিক। সে-ধর্মে যিহোবা যীশু ত্রিমূর্তি–সব অন্তর্ধান, জেগে বসছেন ‘মা’! শিশু যীশু-কোলে ‘মা’। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে ‘মা’ ‘মা’ ‘মা’ ! বাদশা ডাকছে ‘মা’, জঙ্গ বাহাদুর (Field-marshal) সেনাপতি ডাকছে ‘মা’, ধ্বজাহস্তে সৈনিক ডাকছে ‘মা’, পোতবক্ষে নাবিক ডাকছে ‘মা’, জীর্ণবস্ত্র ধীবর ডাকছে ‘মা’, রাস্তার কোণে ভিখারী ডাকছে ‘মা’। ‘ধন্য মেরী’, ‘ধন্য মেরী’–দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে।

আর মেয়ের পুজো। এ শক্তিপুজো কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তিপুজো কুমারী-সধবা পুজো আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থস্থানে হয়, বাস্তবিক প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়–সেই শক্তিপুজো। তবে আমাদের পুজো ঐ তীর্থস্থানেই, সেইক্ষণ মাত্র; এদের দিনরাত, বার মাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চ স্থান, আদর, খাতির। এ যে-সে স্ত্রীলোকের পুজো, চেনা-অচেনার পুজো, ভদ্রকুলের তো কথাই নাই, রূপসী যুবতীর তো কথাই নাই। এ পুজো ইওরোপে আরম্ভ করে মূরেরা–মুসলমান আরবমিশ্র মূরেরা–যখন তারা স্পেন বিজয় করে আট শতাব্দী রাজত্ব করে, সেই সময়। তাদের থেকে ইওরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তিপূজার অভ্যুদয়। মূর ভুলে গেল, শক্তিহীন শ্রীহীন হল। স্বস্থানচ্যুত হয়ে আফ্রিকার কোণে অসভ্যপ্রায় হয়ে বাস করতে লাগল, আর সে শক্তির সঞ্চার হল ইওরোপে, ‘মা’ মুসলমানকে ছেড়ে উঠলেন ক্রিশ্চানের ঘরে।

১১. ইওরোপের নবজন্ম

এ ইওরোপ কি? কালো, আদকালা, হলদে, লাল, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার সমস্ত মানুষ এদের পদানত কেন? এরা কেনই বা এ কলিযুগের একাধিপতি?

এ ইওরোপ বুঝতে গেলে পাশ্চাত্য ধর্মের আকর ফ্রাঁস থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইওরোপে, ইওরোপের মহাকেন্দ্র পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতিনীতি, আলোক-আঁধার, ভাল-মন্দ, সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এইখানে—এই পারি নগরীতে।

এ পারি এক মহাসমুদ্র—মণি মুক্তা প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও অনেক। এই ফ্রাঁস ইওরোপের কর্মক্ষেত্র। সুন্দর দেশ—চীনের কতক অংশ ছাড়া এমন দেশ আর কোথাও নেই। নাতিশীতোষ্ণ, অতি উর্বরা, অতিবৃষ্টি নাই, অনাবৃষ্টিও নাই, সে নির্মল আকাশ, মিঠে রৌদ্র, ঘাসের শোভা, ছোট ছোট পাহাড়, চিনার বাঁশ প্রভৃতি গাছ, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট প্রস্রবণ—সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্মত্ততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্যপ্রিয়। আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী, দরিদ্র তাদের ঘোর-দোর ক্ষেত-ময়দান ঘষে মেজে, সাজিয়ে গুজিয়ে ছবিখানি করে রাখছে। এক জাপান ছাড়া এ ভাব আর কোথাও নাই। সেই ইন্দ্রভুবন অট্টালিকাপুঞ্জ, নন্দনকানন উদ্যান, উপবন—মায় চাষার ক্ষেত, সকলের মধ্যে একটু রূপ—একটু সুচ্ছবি দেখবার চেষ্টা এবং সফলও হয়েছে। এই ফ্রাঁস প্রাচীনকাল হতে গোলওয়া (Gauls), রোমক, ফ্রাঁ (Franks) প্রভৃতি জাতির সংঘর্ষভূমি; এই ফ্রাঁ জাতি রোমসম্রাজ্যের বিনাশের পর ইওরোপে একাধিপত্য লাভ করলে, এদের বাদশা শার্লামাঞ্চন (Charlemagne) ইওরোপে ক্রিশ্চান ধর্ম তলওয়ারের দাপটে চালিয়ে দিলেন এই ফ্রাঁ জাতি হতেই এশিয়াখণ্ডে ইওরোপের প্রচার, তাই আজও ইওরোপী আমাদের কাছে ফ্রাঁকি, ফেরিঙ্গী, প্লাঁকি, ফিলিঙ্গ ইত্যাদি।

সভ্যতার আকর প্রাচীন গ্রীস ডুবে গেল। রাজচক্রবর্তী রোম বর্বর (Barbars) আক্রমণ-তরঙ্গে তলিয়ে গেল। ইওরোপের আলো নিবে গেল, এদিকে আর এক অতি বর্বরজাতি

এশিয়াখণ্ডে প্রাদুর্ভাব হল—আরবজাতি। মহাবেগে সে আরব-তরঙ্গ পৃথিবী ছাইতে লাগল। মহাবল পারস্য আরবের পদানত হল, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে হল, কিন্তু তার ফলে মুসলমান ধর্ম আর এক রূপ ধারণ করলে; সে আরবী ধর্ম আর পারসিক সভ্যতা সম্মিলিত হল।

আরবের তলওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে পারস্য সভ্যতা ছড়িয়ে পড়তে লাগল, যে পারস্য সভ্যতা প্রাচীন গ্রীস ও ভারতবর্ষ হতে নেওয়া। পূর্ব পশ্চিম দুদিক হতে মহাবলে মুসলমান তরঙ্গ ইওরোপের উপর আঘাত করলে, সঙ্গে সঙ্গে বর্বর অন্ধ ইওরোপে জ্ঞানালোক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রাচীন গ্রীকদের বিদ্যা বুদ্ধি শিল্প বর্বরাক্রান্ত ইতালীতে প্রবেশ করলে, ধরা-রাজধানী রোমের মৃত শরীরে প্রাণস্পন্দন হতে লাগল—সে স্পন্দন ফ্লরেন্স নগরীতে প্রবল রূপ ধারণ করলে, প্রাচীন ইতালী নবজীবনে বেঁচে উঠতে লাগল, এর নাম রেনেসাঁ (Renaissance)—নবজন্ম। কিন্তু সে নবজন্ম হল ইতালীর। ইওরোপের অন্যান্য অংশের তখন প্রথম জন্ম। সে ক্রিশ্চানী ষোড়শ শতাব্দীতে—যখন আকবর, জাহাঁগীর, শাজাহাঁ প্রভৃতি মোগল সম্রাট্ ভারতে মহাবল সাম্রাজ্য তুলেছেন, সেই সময় ইওরোপের জন্ম হল।

ইতালী বুড়ো জাত, একবার সাড়াশব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। সে সময় নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু, আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত নানা কারণে আবার পাশ ফিরে শুলো।

ইওরোপে ইতালীর পুনর্জন্ম গিয়ে লাগলো বলবান্ অভিনব নূতন ফ্রাঁ জাতিতে। চারিদিক হতে সভ্যতার ধারা সব এসে ফ্লরেন্স নগরীতে একত্র হয়ে নূতন রূপ ধারণ করলে; কিন্তু ইতালী জাতিতে সে বীর্যধারণের শক্তি ছিল না, ভারতের মত সে উন্মেষ ঐখানেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু ইওরোপের সৌভাগ্য, এই নূতন ফ্রাঁ জাতি আদরে সে তেজ গ্রহণ করলে। নবীন রক্ত, নবীন জাত সে তরঙ্গে মহাসাহসে নিজের তরণী ভাসিয়ে দিলে, সে স্রোতের বেগ ক্রমশই বাড়তে লাগল, সে এক ধারা শতধারা হয়ে বাড়তে লাগল; ইওরোপের আর

আর জাতি লোলুপ হয়ে খাল কেটে সে জল আপনার আপনার দেশে নিয়ে গেল এবং তাতে নিজেদের জীবনীশক্তি ঢেলে তার বেগ, তার বিস্তার বাড়াতে লাগল, ভারতে এসে সে তরঙ্গ লাগল; জাপান সে বন্যায় বেঁচে উঠল, সে জল পান করে মত্ত হয়ে উঠল; জাপান এশিয়ার নূতন জাত।

পারি ও ফ্রাঁস

এই পারি নগরী সে ইওরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী, সদানন্দ-নগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ—না লণ্ডনে, না বার্লিনে, না আর কোথায়। লণ্ডনে, নিউ ইয়র্কে ধন আছে; বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট, নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন থাক, বিদ্যাবুদ্ধি থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও থাক—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক মরে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছ্যাবলা আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসী মুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।

এই পারি বিশ্ববিদ্যালয় ইওরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞান সভা এদের একাডেমির নকল; এই পারি ঔপনিবেশ-সাম্রাজ্যের গুরু, সকল ভাষাতেই যুদ্ধ-শিল্পের সংজ্ঞা এখনও অধিকাংশ ফরাসী; এদের রচনার নকল সকল ইওরোপী ভাষায়; দর্শন বিজ্ঞান শিল্পের এই পারি খনি, সকল জায়গায় এদের নকল।

এরা হচ্ছে শহুরে, আর সব জাত যেন পাড়াগেঁয়ে। এরা যা করে তা ৫০ বৎসর, ২৫ বৎসর পরে জার্মান ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিদ্যায় হোক বা শিল্পে হোক, বা সমাজনীতিতেই হোক। এই ফরাসী সভ্যতা স্কটল্যাণ্ডে লাগল, স্কটরাজ ইংলণ্ডের রাজা হলেন, ফরাসী সভ্যতা ইংলণ্ডকে জাগিয়ে তুললে; স্কটরাজ স্টুয়ার্ট বংশের সময় ইংলণ্ডে রয়াল সোসাইটি প্রভৃতির সৃষ্টি।

আর এই ফ্রাঁস স্বাধীনতার আবাস। প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারি নগরী হতে ইওরোপ তোলপাড় করে ফেলেছে, সেই দিন হতে ইওরোপের নূতন মূর্তি হয়েছে। সে 'এগালিতে, লিবার্তে, ফ্রাতের্নিতে' র (Egalite', Liberte, Fraternite—সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব) ধ্বনি ফ্রাঁস হতে চলে গেছে; ফ্রাঁস অন্য ভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করছে, কিন্তু ইওরোপের অন্যান্য জাত এখনও সেই ফরাসী বিপ্লব মক্‌শ করছে।

একজন স্কটল্যাণ্ড দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমায় সেদিন বললেন যে, পারি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র; যে দেশ যে পরিমাণে এই পারি নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতি লাভ করবে। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত সত্য; কিন্তু এ-কথাটাও সত্য যে, যদি কারু কোন নূতন ভাব এ জগৎকে দেবার থাকে তো এই পারি হচ্ছে সে প্রচারের স্থান। এই পারিতে যদি ধ্বনি ওঠে তো ইওরোপ অবশ্যই প্রতিধ্বনি করবে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, নর্তকী—এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারলে আর সব দেশে সহজেই প্রতিষ্ঠা হয়।

আমাদের দেশে এই পারি নগরীর বদনামই শুনতে পাওয়া যায়, এ পারি মহাকদর্য বেশ্যাপূর্ণ নরককুণ্ড। অবশ্য এ-কথা ইংরেজরাই বলে থাকে, এবং অন্য দেশের যে সব লোকের পয়সা আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দ্বিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব, তারা অবশ্য বিলাসময় জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারিই দেখে!

কিন্তু লণ্ডন, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউ ইয়র্কও ঐ বারবনিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগপূর্ণ; তবে তফাত এই যে, অন্য দেশের ইন্দ্রিয়চর্চা পশুবৎ, প্যারিসের—সভ্য পারির ময়লা সোনার পাতমোড়া; বুনো শোরের পাঁকে লোটা, আর ময়ূরের পেখমধরা নাচে যে তফাত, অন্যান্য শহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ প্যারিস-বিলাসের সেই তফাত।

ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা কোন্ জাতে নেই বল? নইলে দুনিয়ায় যার দু- পয়সা হয়, সে অমনি পারি-নগরী অভিমুখে ছোটে কেন? রাজা-বাদশারা চুপিসাড়ে নাম ভাঁড়িয়ে এ বিলাস-

বিবর্তে স্নান করে পবিত্র হতে আসেন কেন? ইচ্ছা সর্বদেশে, উদ্যোগের ত্রুটি কোথাও কম দেখি না; তবে এরা সুসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ করতে জানে, বিলাসের সপ্তমে পৌঁছেছে।

তাও অধিকাংশ কদর্য নাচ-তামাসা বিদেশীর জন্য। ফরাসী বড় সাবধান, বাজে খরচ করে না। এই ঘোর বিলাস, এই সব হোটেল কাফে, যাতে একবার খেলে সর্বস্বান্ত হতে হয়, এ-সব বিদেশী আহাম্মক ধনীদের জন্য। ফরাসীরা বড় সুসভ্য, আদব-কায়দা বেজায়, খাতির খুব করে, পয়সাগুলি সব বার করে নেয়, আর মুচকে মুচকে হাসে।

তা ছাড়া, আর এক তামাসা এই যে, আমেরিকান জার্মান ইংরেজ প্রভৃতির খোলা সমাজ, বিদেশী ঝাঁ করে সব দেখতে শুনতে পায়। দু-চার দিনের আলাপেই আমেরিকান বাড়ীতে দশ দিন বাস করবার নিমন্ত্রণ করে; জার্মান তদ্রূপ; ইংরেজ একটু বিলম্বে। ফরাসী এ বিষয়ে বড় তফাত, পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত না হলে আর বাস করতে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু যখন বিদেশী ঐ প্রকার সুবিধা পায়, ফরাসী পরিবার দেখবার জানবার অবকাশ পায়, তখন আর এক ধারণা হয়। বলি, মেছবাজার দেখে অনেক বিদেশী যে আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে—সেটা কেমন আহাম্মকি? তেমনি এ পারি। অবিবাহিতা মেয়ে এদেশে আমাদের দেশের মত সুরক্ষিতা, তারা সমাজে প্রায় মিশতে পায় না। বে-র পর তবে নিজের স্বামীর সঙ্গে সমাজে মেশে; বে-থা মায়ে বাপে দেয়, আমাদের মত। আর এরা আমোদপ্রিয়, কোন বড় সামাজিক ব্যাপার নর্তকীর নাচ না হলে সম্পূর্ণ হয় না। যেমন আমাদের বে পুজো—সর্বত্র নর্তকীর আগমন। ইংরেজ ওলবাটা-মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ, ওদের মতে এ বড় অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটারে হলে আর দোষ নেই। এ-কথাটাও বলি যে, এদের নাচটা আমাদের চোখে অশ্লীল বটে, তবে এদের সয়ে গেছে। নেংটি নাচ সর্বত্র, ও গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু ইংরেজ আমেরিকান দেখতেও ছাড়বে না, আর ঘরে গিয়ে গাল দিতেও ছাড়বে না।

স্ত্রী-সম্বন্ধী আচার পৃথিবীর সর্বদেশেই একরূপ, অর্থাৎ পুরুষ-মানুষের অন্য স্ত্রীসংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাটায় মুশকিল। তবে ফরাসী পুরুষ একটু খোলা, অন্য দেশের ধনী লোকেরা যেমন এ সম্বন্ধে বেপরোয়া, তেমনি। আর ইওরোপী পুরুষসাধারণ

ও-বিষয়টা অত দোষের ভাবে না। অবিবাহিতের ও-বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বড় দোষের নয়; বরং বিদ্যার্থী যুবক ও-বিষয়ে একান্ত বিরত থাকলে অনেক স্থলে তার মা-বাপ দোষাবহ বিবেচনা করে, পাছে ছেলেটা 'মেনিমুখো' হয়। পুরুষের এক গুণ পাশ্চাত্য দেশে চাই–সাহস; এদের 'ভার্চু' (virtue) শব্দ আর আমাদের 'বীরত্ব' একই শব্দ। ঐ শব্দের ইতিহাসেই দেখ, এরা কাকে পুরুষের সততা বলে। মেয়েমানুষের পক্ষে সতীত্ব অত্যাবশ্যক বটে।

এ সকল কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জাতির এক-একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হতে সে জাতির রীতিনীতি বিচার করতে হবে। তাদের চোখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চোখে আমাদের দেখা–এ দুই ভুল।

আমাদের উদ্দেশ্য এ বিষয়ে এদের ঠিক উল্টা, আমাদের ব্রহ্মচারী (বিদ্যার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার্থী আর কামজিৎ একই কথা।

আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য বিনা তা কেমনে হয়, বল? এদের উদ্দেশ্য ভোগ, ব্রহ্মচর্যের আবশ্যক তত নাই; তবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ হলে ছেলেপিলে জন্মায় না এবং সমগ্র জাতির ধ্বংস। পুরুষ-মানুষে দশ গণ্ডা বে করলে তত ক্ষতি নাই, বরং বংশবৃদ্ধি খুব হয়। স্ত্রীলোকের একটা ছাড়া আর একটা একসঙ্গে চলে না–ফল বন্ধ্যাত্ব। কাজেই সকল দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর বিশেষ আগ্রহ, পুরুষের বাড়ার ভাগ। 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।' ১৬

যাক, মোদ্দা এমন শহর আর ভূমণ্ডলে নাই। পূর্বকালে এ শহর ছিল আর একরূপ, ঠিক আমাদের কাশীর বাঙালীটোলার মত। আঁকাবাঁকা গলি রাস্তা, মাঝে মাঝে দুটো বাড়ী এক-করা খিলান, দ্যালের গায়ে পাতকো, ইত্যাদি। এবারকার এগজিবিশনে একটা ছোট পুরানো পারি তৈরী করে দেখিয়েছি। সে পারি কোথায় গেছে, ক্রমিক বদলেছে, এক-

একবার লড়াই-বিদ্রোহ হয়েছে, কতক অংশ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, আবার পরিষ্কার নূতন ফর্দা১৭ পারি সেই স্থানে উঠেছে।

বর্তমান পারি অধিকাংশই তৃতীয় ন্যাপোলেঅঁর (Napoleon III) তৈরী। তু-ন্যাপোলেঅঁর মেরে কেটে জুলুম করে বাদশা হলেন। ফরাসীজাতি সেই প্রথম বিপ্লব (French Revolution) হওয়া অবধি সতত টলমল; কাজেই বাদশা প্রজাদের খুশী রাখবার জন্য, আর পারি নগরীর সতত-চঞ্চল গরীব লোকদের কাজ দিয়ে খুশী করবার জন্য ক্রমাগত রাস্তা ঘাট তোরণ থিয়েটার প্রভৃতি গড়তে লাগলেন। অবশ্য—পারির সমস্ত পুরাতন মন্দির তোরণ স্তম্ভ প্রভৃতি রইল; রাস্তা ঘাট সব নূতন হয়ে গেল। পুরানো শহর—পগার পাঁচিল সব ভেঙে বুলভারের (boulevards) অভ্যুদয় হতে লাগল। এবং তা হতেই শহরের সর্বোত্তম রাস্তা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শাঁজেলিজে (Champs Elypsees)। রাস্তা তৈরী হল। এ রাস্তা এত বড় চওড়া যে, মধ্যখানে এবং দুপাশ দিয়ে বাগান চলেছে এবং একস্থানে অতি বৃহৎ গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার নাম 'প্লাস্ দ লা কনকর্দ' (Place de la Concorde) এই 'প্লাস্ দ লা কনকর্দে'র চারিদিকে প্রায় সমান্তরালে ফ্রাঁসের প্রত্যেক জেলার এক এক যান্ত্রিক নারীমূর্তি। তার মধ্যে একটি মূর্তি হচ্ছে ষ্ট্রাসবুর্গ নামক জেলার। ঐ জেলা এখন ডইচ১৮(জার্মান)-রা ১৮৭২ সালের লড়ায়ের পর হতে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সে দুঃখ ফ্রাঁসের আজও যায় না, সে মূর্তি দিনরাত প্রেতোদ্দিষ্ট ফুলমালায় ঢাকা। যে রকমের মালা লোকে আত্মীয়-স্বজনের গোরের ওপর দিয়ে আসে, সেই রকম বৃহৎ মালা দিনরাত সে মূর্তির উপর কেউ না কেউ দিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লীর চাঁদনি-চৌক কতক অংশে এই 'প্লাস্ দ লা কনকর্দের' মত এককালে ছিল বলে বোধ হয়। স্থানে স্থানে জয়স্তম্ভ, বিজয়তোরণ আর বিরাট নরনারী সিংহাদি ভাস্কর্যমূর্তি। মহাবীর প্রথম ন্যাপোলেঅঁর স্মারক এক সুবৃহৎ ধাতুনির্মিত বিজয়স্তম্ভ। তার গায়ে ন্যাপোলেঅঁর সময়ের যুদ্ধ-বিজয় অঙ্কিত। ওপরে তাঁর মূর্তি। আর একস্থানে প্রাচীন দুর্গ বাস্তিল (Bastille) ধ্বংসের স্মারক চিহ্ন। তখন রাজাদের একাধিপত্য ছিল, যাকে তাকে যখন তখন জেলে পুরে দিত। বিচার না, কিছু না, রাজা এক হুকুম লিখে দিতেন; তার

নাম 'লেটর দ ক্যাশে' (Lettre de Cachet)—মানে, রাজ-মুদ্রাঙ্কিত লিপি। তারপর সে ব্যক্তি আর কি করেছে কিনা, দোষী কি নির্দোষ, তার আর জিজ্ঞাসা-পড়া নেই, একেবারে নিয়ে পুরলে সেই বাস্তিলে; সেখান থেকে বড় কেউ আর বেরুত না। রাজাদের প্রণয়িনীরা কারু উপর চটলে রাজার কাছ থেকে ঐ শীলটা করিয়ে নিয়ে সে ব্যক্তিকে বাস্তিলে ঠেলে দিত। পরে যখন দেশসুদ্ধ লোক এ সব অত্যাচারে ক্ষেপে উঠল, 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা', 'সব সমান', 'ছোট বড় কিছুই নয় '—এ ধ্বনি উঠল, পারির লোক উন্মত্ত হয়ে রাজারাণীকে আক্রমণ করলে, সে সময় প্রথমেই এ মানুষের অত্যাচারের ঘোর নিদর্শন বাস্তিল ভূমিসাৎ করলে, সে স্থানটায় এক রাত ধরে নাচগান আমোদ করলে। তারপর রাজা পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ধরে ফেললে, রাজার শ্বশুর অষ্ট্রীয়ার বাদশা জামায়ের সাহায্যে সৈন্য পাঠাচ্ছেন শুনে, প্রজারা ক্রোধে অন্ধ হয়ে রাজারাণীকে মেরে ফেললে, দেশসুদ্ধ লোকে 'স্বাধীনতা সাম্যের' নামে মেতে উঠল, ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র (republic) হল; অভিজাত ব্যক্তির মধ্যে যাকে ধরতে পারলে তাকেই মেরে ফেললে, কেউ কেউ উপাধি-টুপাধি ছেড়ে প্রজার দলে মিশে গেল। শুধু তাই নয়, বললে 'দুনিয়াসুদ্ধ লোক, তোমরা ওঠ, রাজা-ফাজা অত্যাচারী সব মেরে ফেল, সব প্রজা স্বাধীন হোক, সকলে সমান হোক!' তখন ইওরোপসুদ্ধ রাজারা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল—এ আগুন পাছে নিজেদের দেশে লাগে, পাছে নিজেদের সিংহাসন গড়িয়ে পড়ে যায় তাই তাকে নেবাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে চারিদিক থেকে ফ্রাঁস আক্রমণ করলে। এদিকে প্রজাতন্ত্রের কর্তৃপক্ষেরা 'লা পাত্রি আ দাঁজে'—জন্মভূমি বিপদে—এই ঘোষণা করে দিলে; সে ঘোষণা আগুনের মত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ছেলেবুড়ো, মেয়েমদ্দ 'মার্সাইএ' মহাগীত (La Marseillaise) গাইতে গাইতে—উৎসাহপূর্ণ ফ্রাঁসের মহাগীত গাইতে গাইতে, দলে দলে, জীর্ণবসন, সে শীতে নগ্নপদ, অত্যল্পান্ন ফরাসী প্রজা-ফৌজ বিরাট সমগ্র ইওরোপীয় চমুর সম্মুখীন হল, বড় ছোট ধনী দরিদ্র—সব বন্দুক ঘাড়ে বেরুল, 'পরিত্রাণায় ... বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'[১৯] বেরুল। সমগ্র ইওরোপ সে বেগ সহ্য করতে পারলে না। ফরাসী জাতির অগ্রে সৈন্যদের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে এক বীর—তাঁর অঙ্গুলি-হেলনে ধরা কাঁপতে লাগল, তিনি ন্যাপোলেঅঁর।

স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব—বন্দুকের নালমুখে, তলওয়ারের ধারে ইওরোপের অস্থিমজ্জার প্রবেশ করিয়ে দিলে, তিন-রঙা ককার্ডের (Cocarde) জয় হল। তারপর ন্যাপোলেঅঁ ফ্রাঁস মহারাজ্যকে দৃঢ়বদ্ধ সাবয়ব করবার জন্য বাদশা হলেন। তারপর তাঁর কার্য শেষ হল; ছেলে হল না বলে সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী ভাগ্যলক্ষী রাজ্ঞী জোসেফিনকে ত্যাগ করলেন, অষ্ট্রীয়ার বাদশার মেয়ে বে করলেন। জোসেফিনের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাগ্য ফিরল, রুশ জয় করতে গিয়ে বরফে তাঁর ফৌজ মারা গেল। ইওরোপ বাগ পেয়ে তাঁকে জোর করে সিংহাসন ত্যাগ করিয়ে একটা দ্বীপে পাঠিয়ে দিলে, পুরানো রাজার বংশের একজনকে তক্তে বসালে।

মরা সিঙ্গি সে দ্বীপ থেকে পালিয়ে আবার ফ্রাঁসে হাজির হল, ফ্রাঁসসুদ্ধ লোক আবার তাঁকে মাথায় করে নিলে, রাজা পালাল। কিন্তু অদৃষ্ট ভেঙেছে, আর জুড়ল না—আবার ইওরোপসুদ্ধ পড়ে তাঁকে হারিয়ে দিলে, ন্যাপোলেঅঁ ইংরেজদের এক জাহাজে উঠে শরণাগত হলেন; ইংরেজরা তাঁকে 'সেণ্ট হেলেনা' নামক দূর একটা দ্বীপে বন্দী রাখলে—আমরণ। আবার পুরানো রাজা এল, তার ভাইপো রাজা হল। আবার ফ্রাঁসের লোক ক্ষেপে উঠল, রাজা-ফাজা তাড়িয়ে দিলে, আবার প্রজাতন্ত্র হল। মহাবীর ন্যাপোলেঅঁর এক ভাইপো এ-সময়ে ক্রমে ফ্রাঁসের প্রীতি-পাত্র হলেন, ক্রমে একদিন ষড়যন্ত্র করে নিজেকে বাদশা ঘোষণা করলেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় ন্যাপোলেঅঁ; দিন কতক তাঁর খুব প্রতাপ হল। কিন্তু জার্মান-যুদ্ধে হেরে তাঁর সিংহাসন গেল, আবার ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল। সেই অবধি প্রজাতন্ত্র চলেছে।

১২. পরিণামবাদ

যে পরিমাণবাদ ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি, এখন সে পরিণামবাদ ইওরোপী বহির্বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে। ভারত ছাড়া অন্যত্র সকল দেশের ধর্মে ছিল এই যে—দুনিয়াটা সব টুকরা টুকরা, আলাদা আলাদা। ঈশ্বর একজন আলাদা, প্রকৃতি একটা আলাদা, মানুষ একটা আলাদা, ঐ রকম পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, গাছপালা, মাটি, পাথর ধাতু প্রভৃতি—সব আলাদা আলাদা! ভগবান্ ঐ রকম আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন।

জ্ঞান মানে কিনা, বহুর মধ্যে এক দেখা। যেগুলো আলাদা, তফাত বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা। যে সম্বন্ধ এই ঐক্য মানুষ দেখতে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে 'নিয়ম' বলে; এরই নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

পূর্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল; ও-সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে; মাটি, পাথর, গাছপালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং—এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে। অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমায় পৌঁছুলেন, বললেন যে সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ এক, তার নাম 'ব্রহ্ম' আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে, ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন 'মায়া', 'অবিদ্যা' অর্থাৎ অজ্ঞান। এই হল জ্ঞানের চরম সীমা।

ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দাও, বিদেশে যদি এ-কথাটা এখন কেউ বুঝতে না পারে তো তাকে আর পণ্ডিত কি করে বলি। মোদ্দা, এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছে, এদের রকম দিয়ে—জড় বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে। তা সে 'এক' কেমন করে হল, এ কথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি যে ওখানটা বুদ্ধির

অতীত, এরাও তাই করেছে। তবে সে ‘এক’ কি কি রকম হয়েছে, কি কি রকম জাতিত্ব ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এটার খোঁজের নাম বিজ্ঞান (Science)।

১৩. সমাজের ক্রমবিকাশ

কাজেই এখন এদেশে প্রায় সকলেই পরিণামবাদী—Evolutionist. যেমন ছোট জানোয়ার বদলে বদলে বড় জানোয়ার হচ্ছে, বড় জানোয়ার কখনও কখনও ছোট হচ্ছে, লোপ পাচ্ছে; তেমনি মানুষ যে একটা সুসভ্য অবস্থায় দুম করে জন্ম পেলে, এ কথা আর কেউ বড় বিশ্বাস করছে না। বিশেষ এদের বাপ-দাদা কাল না পরশু বর্বর ছিল, তা থেকে অল্পদিনে এই কাণ্ড। কাজেই এরা বলছে যে, সমস্ত মানুষ ক্রমে ক্রমে অসভ্য অবস্থা থেকে উঠেছে এবং উঠছে। আদিম মানুষ কাঠ-পাথরের যন্ত্রতন্ত্র দিয়ে কাজ চালাত, চামড়া বা পাতা পরে দিন কাটাত, পাহাড়ের গুহায় বা পাখীর বাসার মত কুঁড়েঘরে গুজরান করত। এর নিদর্শন সর্বদেশের মাটির নীচে পাওয়া যাচ্ছে এবং কোন কোন স্থলে সে অবস্থার মানুষ স্বয়ং বর্তমান। ক্রমে মানুষ ধাতু ব্যবহার করতে শিখলে, সে নরম ধাতু—টিন আর তামা। তাকে মিশিয়ে যন্ত্রতন্ত্র অস্ত্রশস্ত্র করতে শিখলে। প্রাচীন গ্রীক, বাবিল, মিসরীরাও অনেকদিন পর্যন্ত লোহার ব্যবহার জানত না—যখন তারা অপেক্ষাকৃত সভ্য হয়েছিল, বই পত্র পর্যন্ত লিখত, সোনা রুপো ব্যবহার করত, তখন পর্যন্ত। আমেরিকা মহাদ্বীপের আদিম নিবাসীদের মধ্যে মেক্সিকো পেরু মায়া প্রভৃতি জাতি অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করত, সোনা রুপোর খুব ব্যবহার ছিল (এমন কি ঐ সোনা-রুপোর লোভেই স্পানি লোকেরা তাদের ধ্বংস সাধন করলে)। কিন্তু সে সমস্ত কাজ চকমকি পাথরের অস্ত্রদ্বারা অনেক পরিশ্রমে করত, লোহার নাম-গন্ধও জানত না।

আদিম অবস্থায় মানুষ তীর ধনুক বা জালাদি উপায়ে জন্তু জানোয়ার মাছ মেরে খেত, ক্রমে চাষবাস শিখলে, পশুপালন করতে শিখলে। বনের জানোয়ারকে বশে এনে নিজের কাজ করতে লাগল। অথবা সময়মত আহারেরও জন্য জানোয়ার পালতে লাগল। গরু, ঘোড়া, শূকর, হাতী, উট, ভেড়া, ছাগল, মুরগী প্রভৃতি পশু-পক্ষী মানুষের গৃহপালিত হতে লাগল! এর মধ্যে কুকুর হচ্ছেন মানুষের আদিম বন্ধু।

আবার চাষবাস আরম্ভ হল। যে ফল-মূল শাক-সবজি ধান-চাল মানুষে খায়, তার বুনো অবস্থা আর এক রকম। এ মানুষের যত্নে বুনো ফল বুনো ঘাস নানাপ্রকার সুখাদ্য বৃহৎ ও উপাদেয় ফলে পরিণত হল। প্রকৃতিতে আপনি-আপনি দিনরাত অদলবদল তো হচ্ছেই। নানাজাতের বৃক্ষলতা পশুপক্ষী শরীর সংসর্গে দেশ-কাল-পরিবর্তনে নবীন নবীন জাতির সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু মানুষ-সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতি ধীরে ধীরে তরুলতা, জীবজন্তু বদলাচ্ছিলেন, মানুষ জন্মে অবধি সে হুড়মুড় করে বদলে দিতে লাগল। সাঁ সাঁ করে এক দেশের গাছপালা জীবজন্তু অন্য দেশে মানুষ নিয়ে যেতে লাগল, তাদের পরস্পর মিশ্রণে নানাপ্রকার অভিনব জীবজন্তুর, গাছপালার জাত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হতে লাগল।

আদিম অবস্থায় বিবাহ থাকে না, ক্রমে ক্রমে যৌনসম্বন্ধ উপস্থিত হল। প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ সর্বসমাজে মায়ের উপর ছিল। বাপের বড় ঠিকানা থাকত না। মায়ের নামে ছেলেপুলের নাম হত। মেয়েদের হাতে সমস্ত ধন থাকত ছেলে মানুষ করবার জন্য। ক্রমে ধন-পত্র পুরুষের হাতে গেল, মেয়েরাও পুরুষের হাতে গেল। পুরুষ বললে, 'যেমন এ ধনধান্য আমার' আমি চাষবাস করে বা লুঠতরাজ করে উপার্জন করেছি, এতে যদি কেউ ভাগ বসায় তো আমি বিরোধ করব', তেমনি বললে, 'এ মেয়েগুলো আমার, এতে যদি কেউ হস্তার্পণ করে তো বিরোধ হবে।' বর্তমান বিবাহের সূত্রপাত হল। মেয়েমানুষ–পুরুষের ঘটি বাটি গোলাম প্রভৃতি অধিকারের ন্যায় হল। প্রাচীন রীতি–একদলের পুরুষ অন্যদলে বে করত। সে বিবাহও জবরদস্তি–মেয়ে ছিনিয়ে এনে। ক্রমে সে কাড়াকাড়ি বদলে গেল, স্বেচ্ছায় বিবাহ চলল; কিন্তু সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস থাকে। এখনও প্রায় সর্বদেশে বরকে একটা নকল আক্রমণ করে। বাঙলাদেশে, ইওরোপে চাল দিয়ে বরকে আঘাত করে, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে কনের আত্মীয় মেয়েরা বরযাত্রীদের গালিগালাজ করে, ইত্যাদি।

১৪. দেবতা ও অসুর

সমাজ সৃষ্টি হতে লাগল। দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস করত, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত; যারা সমতল জমিতে, তাদের–চাষবাস; যারা পার্বত্য দেশে, তারা ভেড়া চরাত; যারা মরুময় দেশে, তারা ছাগল উট চরাতে লাগল; কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস করে, শিকার করে খেতে লাগল। যারা সমতল দেশ পেলে, চাষবাস শিখলে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগল। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্বল হতে লাগল। যাদের শরীর দিনরাত খোলা হাওয়ায় থাকে, মাংসপ্রধান আহার তাদের; আর যারা ঘরের মধ্যে বাস করে, শস্যপ্রধান আহার তাদের; অনেক পার্থক্য হতে লাগল! শিকারী বা পশুপাল বা মৎসজীবী আহারে অনটন হলেই ডাকাত বা বোম্বেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুঠতে আরম্ভ করলে। সমতলবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য ঘনদলে সন্নিবিষ্ট হতে লাগল, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্টি হতে লাগল।

দেবতারা ধান চাল খায়, সুসভ্য অবস্থা, গ্রাম নগর উদ্যানে বাস, পরিধান–বোনা কাপড়; আর অসুরদের পাহাড় পর্বত মরুভূমি বা সমুদ্রতটে বাস; আহার বন্য জানোয়ার, বন্য ফলমূল; পরিধান ছাল; আর [আহার] বুনো জিনিষ বা ভেড়া ছাগল গরু, দেবতাদের কাছ থেকে বিনিময়ে যা ধান-চাল। দেবতার শরীর শ্রম সইতে পারে না, দুর্বল। অসুরের২০ শরীর উপবাস, কৃচ্ছ, কষ্ট-সহনে বিলক্ষণ পটু।

অসুরের আহারাভাব হলেই দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্রকূল হতে গ্রাম নগর লুঠতে এল। কখনও বা ধনধান্যের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগল। দেবতারা বহুজন একত্র না হতে পারলেই অসুরের হাতে মৃত্যু; আর দেবতার বুদ্ধি প্রবল হয়ে নানাপ্রকার যন্ত্রতন্ত্র নির্মাণ করতে লাগল। ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র–সব দেবতাদের; অসুরের সাধারণ অস্ত্র, কিন্তু গায়ে বিষম বল। বারংবার অসুর দেবতাদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু অসুর সভ্য হতে জানে না, চাষবাস করতে পারে না, বুদ্ধি চালাতে জানাতে না। বিজয়ী অসুর

যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্গে রাজ্য করতে চায় তো সে কিছুদিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধিকৌশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে। নতুবা অসুর লুঠ করে পরে আপনার স্থানে যায়। দেবতারা যখন একত্রিত হয়ে অসুরদের তাড়ায়, তখন হয় তাদের সমুদ্রমধ্যে তাড়ায়, না হয় পাহাড়ে, না হয় জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয়। ক্রমে দু-দিকেই দল বাড়তে লাগল লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগল, লক্ষ লক্ষ অসুর একত্র হতে লাগল। মহাসংঘর্ষ, মেশামেশি, জেতাজিতি চলতে লাগল।

এ সব রকমের মানুষ মিলেমিশে বর্তমান সমাজ, বর্তমান প্রথাসকলের সৃষ্টি হতে লাগল, নানা রকমে নূতন ভাবের সৃষ্টি হতে লাগল, নানা বিদ্যার আলোচনা চলল। একদল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগল—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেই সব ভোগ্যদ্রব্য রক্ষা করতে লাগল। সকলে মিলে সেই সব বিনিময় করতে লাগল, আর মাঝখান থেকে একদল ওস্তাদ এ-জায়গার জিনিষটা ও-জায়গায় নিয়ে যাবার বেতনস্বরূপ সমস্ত জিনিষের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখলে। একজন চাষ করলে, একজন পাহারা দিলে, একজন বয়ে নিয়ে গেল, আর একজন কিনলে। যে চাষ করলে, সে পেলে ঘোড়ার ডিম; সে পাহারা দিলে, সে জুলুম, করে কতকটা আগ ভাগ নিলে। অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিনলে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো!! পাহারাওয়ালার নাম হল রাজা, মুটের নাম হল সওদাগর। এ দু-দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগল। সে জিনিষ তৈরী করতে লাগল, সে পেটে হাত দিয়ে 'হা ভগবান্' ডাকতে লাগল।

ক্রমে এই সকল ভাব—প্যাঁচাপেঁচি, মহা গেরোর উপর গেরো, তস্য গেরো হয়ে বর্তমান মহা জটিল সমাজ উপস্থিত হলেন। কিন্তু ছিট মরে না। যেগুলো পূর্ব জন্মে২১ ভেড়া চরাত, মাছ ধরে খেত, সেগুলো সভ্য-জন্মে বোম্বেটে ডাকাত প্রভৃতি হতে লাগল। বন নেই যে সে শিকার করে, কাছে পাহাড় পর্বতও নেই যে ভেড়া চড়ায়; জন্মের দরুন শিকার বা ভেড়া চড়ানো বা মাছ ধরা কোনটারই সুবিধা পায় না—সে কাজেই ডাকাতি করে, চুরি করে; সে যায় কোথায়? সে 'প্রাতঃস্মরণীয়া'দের কালের মেয়ে, এ জন্মে তো আর এক

সঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাজেই হয় বেশ্যা। ইত্যাদি রকমে নানা ঢঙের, নানা ভাবের, নানা সভ্য-অসভ্য, দেবতা-অসুর জন্মের মানুষ একত্র হয়ে সমাজ। কাজেই সকল সমাজে এই নানারূপে ভগবান্ বিরাজ করছেন—সাধু নারায়ণ, ডাকাত-নারায়ণ ইত্যাদি। আবার যে সমাজে যে দলে সংখ্যায় অধিক, সে সমাজের চরিত্র সেই পরিমাণে দৈবী বা আসুরী হতে লাগল।

জম্বুদ্বীপের তামাম সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্বর ভূমিতে উৎপন্ন—ইয়ংচিকিয়ং, গঙ্গা, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস-তীর। এ সকল সভ্যতারই আদি ভিত্তি চাষবাস। এ সকল সভ্যতাই দেবতাপ্রধান। আর ইওরোপের সকল সভ্যতাই প্রায় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্রময় দেশে জন্মেছে—ডাকাত আর বোম্বেটে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অসুরভাব অধিক।

বর্তমান কালে যতদূর বোঝা যায়, জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগ ও আরবের মরুভূমি অসুরের প্রধান আড্ডা। ঐ স্থান হতে একত্র হয়ে পশুপাল মৃগয়াজীবী অসুরকুল সভ্য দেবতাদের তাড়া দিয়ে দুনিয়াময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইওরোপখণ্ডের আদিমনিবাসী এক জাত অবশ্য ছিল। তারা পর্বতগহ্বরে বাস করত; যারা ওর মধ্যে একটু বুদ্ধিমান, তারা অল্প গভীর তলাওয়ের জলে খোঁটা পুঁতে মাচান বেঁধে, সেই মাচানের উপর ঘর-দোর নির্মাণ করে বাস করত। চকমকি পাথরের তীর, বর্শার ফলা, চকমকির ছুরি ও পরশু দিয়ে সমস্ত কাজ চালাত।

১৫. দুই জাতির সংঘাত

ক্রমে জম্বুদ্বীপের নরস্রোত ইওরোপের উপর পড়তে লাগল। কোথাও কোথাও অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতের অভ্যুদয় হল; রুশদেশান্তর্গত কোন জাতির ভাষা ভারতের দক্ষিণী ভাষার অনুরূপ।

কিন্তু এ-সকল জাত বর্বর, অতি বর্বর অবস্থায় রইল। এশিয়া মাইনর হতে একদল সুসভ্য মানুষ সন্নিকট দ্বীপপুঞ্জে উদয় হল, ইওরোপের সন্নিকট স্থান অধিকার করলে, নিজেদের বুদ্ধি আর প্রাচীন মিসরের সাহায্যে এক অপূর্ব সভ্যতা সৃষ্টি করলে; তাদের আমরা বলি যবন, ইওরোপীরা বলে গ্রীক।

পরে ইতালীর রোমক (Romans) নামক অন্য এক বর্বর জাতি ইট্রস্কান্ (Etruscans) নামক সভ্য জাতিকে পরাভূত করে, তাদের বুদ্ধিবিদ্যা সংগ্রহ করে নিজেরা সভ্য হল। ক্রমে রোমকেরা চারিদিক অধিকার করলে; ইওরোপখণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের যাবতীয় অসভ্য মানুষ তাদের প্রজা হল। কেবল উত্তরভাগে বনজঙ্গলে বর্বর-জাতিরা স্বাধীন রইল। কালবশে রোম ঐশ্বর্যবিলাসপরতায় দুর্বল হতে লাগল; সেই সময় আবার জম্বুদ্বীপ অসুরবাহিনী ইওরোপের উপর নিক্ষেপ করলে। অসুর-তাড়নায় উত্তর-ইওরোপী বর্বর রোমসাম্রাজ্যের উপর পড়ল! রোম উৎসন্ন হয়ে গেল। জম্বুদ্বীপের তাড়ায় ইওরোপের বর্বর আর ইওরোপের ধ্বংসাবশিষ্ট রোমক-গ্রীক মিলে এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হল; এ সময় য়াহুদীজাতি রোমের দ্বারা বিজিত ও বিতাড়িত হয়ে ইওরোপময় ছড়িয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নূতন ধর্ম ক্রিশ্চানীও ছড়িয়ে পড়ল। এই সকল বিভিন্ন জাত, মত, পথ নানাপ্রকারের অসুরকুল, মহামায়ার মুচিতে,২২ দিবারাত্র যুদ্ধ মারকাটের আগুনে গলে মিশতে লাগল; তা হতেই এই ইওরোপী জাতের সৃষ্টি।

হিঁদুর কালো রঙ থেকে, উত্তরে দুধের মত সাদা রঙ, কালো, কটা, লাল বা সাদা চুল, কালো চোখ, কটা চোখ, নীল চোখ, দিব্যি হিঁদুর মত নাক মুখ চোখ, বা জাঁতামুখো

চীনেরাম—এই সকল আকৃতিবিশিষ্ট এক বর্বর, অতি বর্বর ইওরোপী জাতির সৃষ্টি হয়ে গেল। কিছুকাল তারা আপনা আপনি মারকাট করতে লাগল; উত্তরের গুলো বোম্বেটেরূপে বাগে পেলেই অপেক্ষাকৃত সভ্যগুলোর উৎসাদন করতে লাগল। মাঝখান থেকে ক্রিশ্চান ধর্মের দুই গুরু ইতালীর পোপ (ফরাসী ও ইতালী ভাষায় বলে 'পাপ'), আর পশ্চিমে কনষ্টাণ্টিনোপলসের পাট্রিয়ার্ক, এরা এই জন্তুপ্রায় বর্বর বাহিনীর উপর, তাদের রাজারাণী—সকলের উপর কর্তাত্তি চালাতে লাগল।

এদিকে আবার আরব মরুভূমে মুসলমানী ধর্মের উদয় হল। বন্যপশুপ্রায় আরব এক মহাপুরুষের প্রেরণাবলে অদম্য তেজে, অনাহত বলে পৃথিবীর উপর আঘাত করলে। পশ্চিম পূর্ব দুপ্রান্ত হতে সে তরঙ্গ ইওরোপে প্রবেশ করলে। সে স্রোতমুখে ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের বিদ্যাবুদ্ধি ইওরোপে প্রবেশ করতে লাগল।

তাতার জাতি

জম্বুদ্বীপের মাঝখান হতে সেলজুক তাতার (Seljuk Tartars) নামক অসুর জাতি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে এশিয়া-মাইনর প্রভৃতি স্থান দখল করে ফেললে। আরবরা ভারতবর্ষ জয়ের অনেক চেষ্টা করেও সফল হয়নি; মুসলমান-অভ্যুদয় সমস্ত পৃথিবী বিজয় করেও ভারতবর্ষের কাছে কুণ্ঠিত হয়ে গেল। সিন্ধুদের একবার আক্রমণ করেছিল মাত্র, কিন্তু রাখতে পারেনি; তারপর থেকে আর উদ্যম করেনি।

কয়েক শতাব্দীর পর যখন তুর্ক প্রভৃতি তাতার জাতি বৌদ্ধধর্ম ছেড়ে মুসলমান হল, তখন এই তুর্কীরা সমভাবে হিন্দু, পার্শী, আরাব, সকলকে দাস করে ফেললে। ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমান বিজেতার মধ্যে একদলও আরবী বা পার্শী নয়, সব তুর্কাদি তাতার। রাজপুতানার সমস্ত আগন্তুক মুসলমানের নাম তুর্ক—তাই সত্য, ঐতিহাসিক। রাজপুতানার চারণ যে গাইলেন, 'তুরুগণকো বঢ়ি জোর' তাই ঠিক। কুতুবউদ্দিন হতে মোগল বাদশাই পর্যন্ত ও-সব তাতার—যে জাত তিব্বতী, সেই জাত; কেবল হয়েছেন মুসলমান, আর হিঁদু পার্শী বে করে বদলেছেন চাকামুখ। ও সেই প্রাচীন অসুরবংশ। আজও

কাবুল, পারস্য, আরব্য, কনষ্টাণ্টিনোপলে সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছেন সেই অসুর তাতার; গান্ধারী,২৩ ফারসী আরাব সেই তুরস্কের গোলামী করছেন। বিরাট চীনসাম্রাজ্যও সেই তাতার মাঞ্চুর (Manchurian Tartars) পদতলে, তবে সে মাঞ্চু নিজের ধর্ম ছাড়েনি মুসলমান হয়নি, মহালামার (Grand Lama) চেলা। এ অসুর জাত কস্মিন্‌কালে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করে না, জানে মাত্র লড়াই। ও রক্ত না মিশলে যুদ্ধবীর্য বড় হয় না। উত্তর ইওরোপ, বিশেষ রুশের প্রবল যুদ্ধবীর্য—সেই তাতার। রুশ তিন হিস্যে তাতার রক্ত। দেবাসুরের লড়াই এখনও চলবে অনেক কাল। দেবতা অসুরকন্যা বে করে, অসুর দেবকন্যা ছিনিয়ে নেয়—এই রকম করে প্রবল খিচুড়ি জাতের সৃষ্টি হয়।

তাতাররা আরবী খলিফার সিংহাসন কেড়ে নিলে, ক্রিশ্চানদের মহাতীর্থ জিরুসালেম প্রভৃতি স্থান দখল করে ক্রিশ্চানদের তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দিলে, অনেক ক্রিশ্চান মেরে ফেললে। ক্রিশ্চান ধর্মের গুরুরা ক্ষেপে উঠল; ইওরোপময় তাদের সব বর্বর চেলা; রাজা প্রজাকে ক্ষেপিয়ে তুললে—পালে পালে ইওরোপী বর্বর জিরুসালেম উদ্ধারের জন্য এশিয়া- মাইনরে চলল। কতক নিজেরাই কাটাকাটি করে মলো, কতক রোগে মলো, বাকী মুসলমানে মারতে লাগল। সে ঘোর বর্বর ক্ষেপে উঠেছে—মুসলমানেরা যত মারে, তত আসে। সে বুনোর গোঁ। আপনার দলকেই লুঠছে, খাবার না পেলে মুসলমান ধরেই খেয়ে ফেললে। ইংরেজ রাজা রিচার্ড মুসলমান-মাংসে বিশেষ খুশী ছিলেন, প্রসিদ্ধ আছে।

বুনো মানুষ আর সভ্য মানুষের লড়ায়ে যা হয়, তাই হল—জিরুসালেম প্রভৃতি অধিকার করা হল না। কিন্তু ইওরোপ সভ্য হতে লাগল। সে চামড়া-পরা, আম-মাংসখেকো২৪ বুনো ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি এশিয়ার সভ্যতা শিখতে লাগল। ইতালী প্রভৃতি স্থানের নাগা ফৌজ দার্শনিক মত শিখতে লাগল; একদল ক্রিশ্চান নাগা (Knights-Templars) ঘোর অদ্বৈতবেদান্তী হয়ে উঠল; শেষে তারা ক্রিশ্চানীকে ঠাট্টা করতে লাগল, এবং তাদের ধনও অনেক সংগৃহীত হয়েছিল; তখন পোপের হুকুমে, ধর্মরক্ষার ভানে ইওরোপী রাজারা তাদের নিপাত করে ধন লুটে নিলে।

১৬. উভয় সভ্যতার তুলনা

এদিকে মুর নামক মুসলমান জাতি স্পান (Spain) দেশে অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন করলে, নানাবিদ্যার চর্চা করলে, ইওরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটি হল; ইতালী, ফ্রাঁস, সুদূর ইংলণ্ড হতে বিদ্যার্থী বিদ্যা শিখতে এল; রাজারাজড়ার ছেলেরা যুদ্ধবিদ্যা আচার কায়দা সভ্যতা শিখতে এল। বাড়ী ঘর দোর মন্দির সব নূতন ঢঙে বনতে লাগল।

কিন্তু সমগ্র ইওরোপ হয়ে দাঁড়াল এক মহা সেনা-নিবাস—সে ভাব এখনও। মুসলমানেরা একটা দেশ জয় করে, রাজা—আপনার এক বড় টুকরা রেখে বাকী সেনাপতিদের বেঁটে দিতেন। তারা খাজনা দিত না, কিন্তু রাজার আবশ্যক হলেই এতগুলো সৈন্য দিতে হবে। এই রকমে সদা-প্রস্তুত ফৌজের অনেক হাঙ্গামা না রেখে, আবশ্যককালে হাজির প্রবল ফৌজ প্রস্তুত রইল। আজও রাজপুতানায় সে ভাব কতক আছে; ওটা মুসলমানেরা এদেশে আনে। ইওরোপীরা মুসলমানের এ-ভাব নিলে। কিন্তু মুসলমানদের ছিল রাজা, সামন্তচক্র, ফৌজ ও বাকী প্রজা। ইওরোপে রাজা আর সামন্তচক্র বাকী সব প্রজাকে করে ফেললে এক রকম গোলাম। প্রত্যেক মানুষ কোন সামন্তের অধিকৃত মানুষ হয়ে তবে জীবিত রইল—হুকুম মাত্রেই প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধযাত্রায় হাজির হতে হবে।

ইওরোপী সভ্যতা নামক বস্ত্রের এই সব হল উপকরণ। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ী সমুদ্রতটময় প্রদেশ; এর তুলো হচ্ছে—সর্বদা যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ নানা-জাতের মিশ্রণে এক মহা খিচুড়ি-জাত। এর টানা হচ্ছে—যুদ্ধ, আত্মরক্ষার জন্য, ধর্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ। সে তলওয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড়; যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে কোন বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবনধারণ করে। এর পোড়েন—বাণিজ্য। এ সভ্যতার উপায় তলওয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ-পারলৌকিক ভোগ।

আমাদের কথাটা কি? আর্যরা শান্তিপ্রিয়, চাষবাস করে, শস্যাদি উৎপন্ন করে শান্তিতে স্ত্রী-পরিবার পালন করতে পেলেই খুশী। তাতে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট; কাজেই

চিন্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক। আমাদের জনক রাজা স্বহস্তে লাঙ্গল চালাচ্ছেন এবং সে কালের সর্বশ্রেষ্ট আত্মাবিৎও তিনি। ঋষি, মুনি, যোগীর অভ্যুদয়–গোড়া থেকে; তাঁরা প্রথম হতেই জেনেছেন যে, সংসারটা ধোঁকা, লড়াই কর আর লুঠই কর, ভোগ বলে যা খুঁজছ তা আছে শান্তিতে; শান্তি আছেন শারীরিক ভোগ-বিসর্জনে; ভোগ আছেন মননশীলতায়, বুদ্ধিচর্চায়; শরীরচর্চায় নেই। জঙ্গল আবাদ করা তাদের কাজ। তারপর, প্রথমে সে পরিষ্কৃত ভূমিতে নির্মিত হল যজ্ঞ বেদী, উঠল সে নির্মল আকাশে যজ্ঞের ধূম, সে বায়ুতে বেদমন্ত্র প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, গবাদি পশু নিঃশঙ্কে চরতে লাগল। বিদ্যা ও ধর্মের পায়ের নীচে তলওয়ার রইল। তার একমাত্র কাজ ধর্মরক্ষা করা, মানুষ ও গবাদি পশুর পরিত্রাণ করা, বীরের নাম আপৎ-ত্রাতা ক্ষত্রিয়। লাঙ্গল, তলওয়ার সকলের অধিপতি রক্ষক রইলেন ধর্ম। তিনি রাজার রাজা, জগৎ নিদ্রিত হলেও তিনি সদা জাগরূক। ধর্মের আশ্রয়ে সকলে রইল স্বাধীন।

ঐ যে ইওরোপী পণ্ডিত বলছেন যে, আর্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের 'বুনো' দের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন–ও-সব আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ–আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শোনানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়।

আমি মূর্খ মানুষ, যা বুঝি তাই নিয়েই এ পারি-সভায় বিশেষ প্রতিবাদ করেছি। এদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করেছি। সময় পেলে আরও সংশয় ওঠাবার আশা আছে। এ কথা তোমাদেরও বলি–তোমরা পণ্ডিত-মনিষ্যি, পুঁথি-পাতড়া খুঁজে দেখ।

ইওরোপীরা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা সুখে বাস করেন, অতএব আর্যরাও তাই করেছে!! ওরা হা-ঘরে, 'হা-অন্ন হা-অন্ন' করে, কাকে লুঠবে মারবে বলে ঘুরে বেড়ায়–আর্যরাও তাই করেছে!! বলি, এর প্রমাণটা কোথায়–আন্দাজ? ঘরে তোমার আন্দাজ রাখগে।

কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখছ যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি? আর রামায়ণ পড়া তো হয়নি, খামকা এক বৃহৎ গল্প—রামায়ণের উপর—কেন বানাচ্ছ?

রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণী বুনো-বিজয়!! বটে—রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য; লড়ছেন কার সঙ্গে?—লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বৈ কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং, কম তো নয়ই। তারপর বানরাদি দক্ষিণী লোক বিজিত হল কোথায়? তারা হল সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বল না?

হতে পারে দু-এক জায়গায় আর্য আর বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে, হতে পারে দু-একটা ধূর্ত মুনি রাক্ষসদের জঙ্গলের মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। মটকা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে, কখন রাক্ষসেরা ঢিলঢেলা হাড়গোড় ছোঁড়ে। যেমন হাড়গোড় ফেলা, অমনি নাকিকান্না ধরে রাজাদের কাছে গমন। রাজারা লোহার জামাপরা, লোহার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়া চড়ে এলেন; বুনো হাড় পাথর ঠেঙ্গা নিয়ে কতক্ষণ লড়বে? রাজারা মেরে ধরে চলে গেল। এ হতে পারে; কিন্তু এতেও বুনোদের জঙ্গল কেড়ে নিয়েছে, কোথায় পাচ্ছ?

অতি বিশাল নদনদীপূর্ণ, উষ্ণপ্রধান সমতল ক্ষেত্র—আর্যসভ্যতার তাঁত। আর্যপ্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো, এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমাচার,২৫ এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নিবারণ।

তুমি ইওরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ? অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্বল জাতি পেয়েছ. তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ, তাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনিষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের

আমেরিকার ইতিহাস কি? তোমাদের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ– তোমাদের আফ্রিকা?

কোথা সে সকল বুনো জাত আজ? একেবারে নিপাত, বন্য পশুবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ; যেখানে তোমাদের শক্তি নাই, সেথা মাত্র অন্য জাত জীবিত।

আর ভারতবর্ষ তা কস্মিন্‌কালেও করেননি। আর্যেরা অতি দয়াল ছিলেন। তাঁদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদয়ে, অমানব-প্রতিভাসম্পন্ন মাথায় ওসব আপাতরমণীয় পাশব প্রণালী কোন কালেও স্থান পায়নি। স্বদেশী আহাম্মক! যদি আর্যেরা বুনোদের মেরে ধরে বাস করত, তা হলে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি কি হত?

ইওরোপের উদ্দেশ্য–সকলকে নাশ করে আমরা বেঁচে থাকব। আর্যদের উদ্দেশ্য– সকলকে আমাদের সমান করব, আমাদের চেয়ে বড় করব। ইওরোপের সভ্যতার উপায়–তলওয়ার; আর্যের উপায়–বর্ণবিভাগ। শিক্ষা সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শেখবার সোপান–বর্ণ-বিভাগ। ইওরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য।

১৭. পরিশিষ্ট *

ইওরোপীরা যার এত বড়াই করে, সে 'সভ্যতার উন্নতি' র (Progress of Civilization) মানে কি? তার মানে এই যে, উদ্দেশ্যসিদ্ধি–অনুচিত উপায়কে উচিত করে। চুরি, মিথ্যা এবং ফাঁসি অথবা ষ্টানলি (Stanley) দ্বারা তাঁর সমভিব্যাহারী ক্ষুধার্ত মুসলমান রক্ষীদের–এক গ্রাস অন্ন চুরি করার দরুন চাবকানো, এ-সকলের ঔচিত্য বিধান করে; 'দূর হও, আমি ওথায় আসতে চাই'-রূপ বিখ্যাত ইওরোপী নীতি, যার দৃষ্টান্ত–যেথায় ইওরোপী-আগমন, সেথাই আদিম জাতির বিনাশ–সেই নীতির ঔচিত্য বিধান করে! এই সভ্যতার অগ্রসরণ লণ্ডন নগরীতে ব্যভিচারকে, পারিতে স্ত্রীপুত্রাদিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালানোকে এবং আত্মহত্যা করাকে 'সামান্য দৃষ্টান্ত' জ্ঞান করে–ইত্যাদি।

এখন ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীব্যাপী ক্ষিপ্র সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে ক্রিশ্চানধর্মের প্রথম তিন শতাব্দীর তুলনা কর। ক্রিশ্চানধর্ম প্রথম তিন শতাব্দীতে জগৎসমক্ষে আপনাকে পরিচিত করতে সমর্থ হয়নি, এবং যখন কনষ্টাণ্টাইন (Constantine)-এর তলওয়ার একে রাজ্যমধ্যে স্থান দিলে, সেদিন থেকে কোন্ কালে ক্রিশ্চানী ধর্ম আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক সভ্যতাবিস্তারের কোন্ সাহায্য করেছে? যে ইওরোপী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করেন যে পৃথিবী সচলা, ক্রিশ্চানধর্ম তাঁর কি পুরস্কার দিয়েছিল? কোন্ বৈজ্ঞানিক কোন্ কালে ক্রিশ্চানী ধর্মের অনুমোদিত? ক্রিশ্চানী সঙ্ঘের সাহিত্য কি দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিজ্ঞানের, শিল্প বা পণ্য-কৌশলের অভাব পূরণ করতে পারে? আজ পর্যন্ত 'চর্চ' প্রোফেন (ধর্ম ভিন্ন অন্য বিষয়াবলম্বনে লিখিত) সাহিত্য-প্রচারে অনুমতি দেন না। আজ যে মনুষ্যের বিদ্যা এবং বিজ্ঞানে প্রবেশ আছে, তার কি অকপট ক্রিশ্চান হওয়া সম্ভব? নিউ টেষ্টামেণ্ট (Testament)-এ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন বিজ্ঞান বা শিল্পের প্রশংসা নেই। কিন্তু এমন বিজ্ঞান বা শিল্প নেই যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোরান বা হদিসের বহু বাক্যের দ্বারা অনুমোদিত এবং উৎসাহিত নয়। ইওরোপের সর্বপ্রধান মনীষিগণ–ইওরোপের ভলটেয়ার, ডারউইন, বুকনার, ফ্লমারিয়ঁ, ভিক্টর হুগো-কুল বর্তমানকালে ক্রিশ্চানী দ্বারা

কটুভাষিত এবং অভিশপ্ত, অপরদিকে এই সকল পুরুষকে ইসলাম বিবেচনা করেন যে, এই সকল পুরুষ আস্তিক, কেবল ইহাদের পয়গম্বর-বিশ্বাসের অভাব। ধর্মসকলের উন্নতির বাধকত্ব বা সহায়কত্ব বিশেষরূপে পরীক্ষিত হোক; দেখা যাবে ইসলাম যেথায় গিয়েছে, সেথায়ই আদিমনিবাসীদের রক্ষা করেছে। সে-সব জাত সেথায় বর্তমান। তাদের ভাষা, জাতীয়ত্ব আজও বর্তমান।

ক্রিশ্চানধর্ম কোথায় এমন কাজ দেখাতে পারে? স্পেনের আরাব, অষ্ট্রেলিয়ার এবং আমেরিকার আদিমনিবাসীরা কোথায়? ক্রিশ্চানেরা ইওরোপী য়াহুদীদের কি দশা এখন করছে? এক দানসংক্রান্ত কার্যপ্রণালী ছাড়া ইওরোপের আর কোন কার্যপদ্ধতি, গস্‌পেলের (Gospel) অনুমোদিত নয়—গস্‌পেলের বিরুদ্ধে সমুত্থিত। ইওরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই ক্রিশ্চানধর্মের বিপক্ষে বিদ্রোহ দ্বারা। আজ যদি ইওরোপে ক্রিশ্চানীর শক্তি থাকত, তাহলে 'পাস্তের' (Pasteur) এবং 'কক' - এর (Koch) ন্যায় বৈজ্ঞানিকসকলকে জীবন্ত পোড়াত এবং ডারউইন-কল্পদের শূলে দিত। বর্তমান ইওরোপে ক্রিশ্চানী আর সভ্যতা—আলাদা জিনিষ। সভ্যতা এখন তার প্রাচীন শত্রু ক্রিশ্চানীর বিনাশের জন্য পাদ্রীকুলের উৎসাদনে এবং তাদের হাত থেকে বিদ্যালয় এবং দাতব্যালয়সকল কেড়ে নিতে কটিবদ্ধ হয়েছে। যদি মূর্খ চাষার দল না থাকত, তাহলে ক্রিশ্চানী তার ঘৃণিত জীবন ক্ষণমাত্র ধারণ করতে সমর্থ হত না এবং সমূলে উৎপাটিত হত; কারণ নগরস্থিত দরিদ্রবর্গ এখনই ক্রিশ্চানী ধর্মের প্রকাশ্য শত্রু! এর সঙ্গে ইসলামের তুলনা কর। মুসলমান-দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের উপরে সংস্থাপিত এবং ইসলামের ধর্মশিক্ষকেরা সমস্ত রাজকর্মচারীদের বহুপূজিত এবং অন্য ধর্মের শিক্ষকেরাও সম্মানিত।

পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর এখন কৃপা একত্রে। শুধু ভোগের জিনিষ সংযোগ হলেই এরা ক্ষান্ত নয়, কিন্তু সকল কাজেই একটু সুচ্ছবি চায়। খাওয়া-দাওয়া ঘর-দোর সমস্তই একটু সুচ্ছবি দেখতে চায়। আমাদের দেশেও ঐ ভাব একদিন ছিল, যখন ধন ছিল! এখন একে দারিদ্র, তার ওপর আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হয়ে যাচ্ছি। জাতীয় যে গুণগুলি

ছিল, তাও যাচ্ছে—পাশ্চাত্য দেশেরও কিছুই পাচ্ছি না! চলা-বসা কথাবার্তায় একটা সেকেলে কায়দা ছিল, তা উৎসন্ন গেছে, অথচ পাশ্চাত্য কায়দা নেবারও সামর্থ্য নেই। পূজা পাঠ প্রভৃতি যা কিছু ছিল, তা তো আমরা বানের জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি, অথচ কালের উপযোগী একটা নূতন রকমের কিছু এখনও হয়ে দাঁড়াচ্ছে না, আমরা এই মধ্যরেখার দুর্দশায় এখন পড়ে।

ভবিষ্যৎ বাঙলাদেশ এখনও পায়ের উপর দাঁড়ায়নি। বিশেষ দুর্দশা হয়েছে শিল্পের। সেকেলে বুড়ীরা ঘরদোর আলপনা দিত, দেওয়ালে চিত্রবিচিত্র করত। বাহার করে কলাপাতা কাটত, খাওয়া-দাওয়া নানাপ্রকার শিল্পচাতুরীতে সাজাত, সে সব চুলোয় গেছে বা যাচ্ছে শীঘ্র শীঘ্র!! নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরানোগুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না কি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যিচচ্চড়ি!! কাজের বিদ্যা কি শিখেছ? এখনও দূর পাড়াগাঁয়ে পুরানো কাঠের কাজ, ইঁটের কাজ দেখে এস গে। কলকেতার ছুতোর এক জোড়া দোর পর্যন্ত গড়তে পারে না! দোর কি আগড় বোঝবার যো নেই!!! কেবল ছুতোরগিরির মধ্যে আছে বিলিতী যন্ত্র কেনা!! এই অবস্থা সর্ববিষয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের যা ছিল, তা তো সব যাচ্ছে; অথচ বিদেশী শেখবার মধ্যে বাকী-যন্ত্রণা মাত্র!! খালি পুঁথি পড়ছ আর পুঁথি পড়ছ! আমাদের বাঙালী আর বিলেতে আইরিশ, এ দুটো এক ধাতের জাত। খালি বকাবকি করছে। বক্তৃতায় এ দু-জাত বেজায় পটু। কাজের—এক পয়সাও নয়, বাড়ার ভাগ দিনরাত পরস্পরে খেয়োখেয়ি করে মরছে!!!

পরিষ্কার সাজান-গোজান এ দেশের (পাশ্চাত্যে) এমন অভ্যাস যে, অতি গরীব পর্যন্তরও ও-বিষয়ে নজর। আর নজর কাজেই হতে হয়—পরিষ্কার কাপড়-চোপড় না হলে তাকে যে কেউ কাজ-কর্মই দেবে না। চাকর-চাকরানী, রাঁধুনী সব ধপধপে কাপড়—দিবারাত্র। ঘরদোর ঝেড়েঝুড়ে, ঘষেমেজে ফিটফাট। এদের প্রধান শায়েস্তা এই যে, যেখানে সেখানে যা তা কখনও ফেলবে না! রান্নাঘর ঝকঝকে—কুটনো-ফুটনো যা ফেলবার তা একটা

পাত্রে ফেলছে, তারপর সেখান হতে দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। উঠানেও ফেলে না। রাস্তায়ও ফেলে না।

যাদের ধন আছে তাদের বাড়ীঘর তো দেখবার জিনিষ—দিনরাত সব ঝকঝক! তার ওপর নানাপ্রকার দেশবিদেশের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করেছে! আমাদের এখন ওদের মত শিল্প-সংগ্রহে কাজ নেই, কিন্তু যেগুলো উৎসন্ন যাচ্ছে, সেগুলোকে একটু যত্ন করতে হবে, না—না? ওদের মত চিত্র বা ভাস্কর্য-বিদ্যা হতে আমাদের এখনও ঢের দেরী! ও দুটো কাজে আমরা চিরকালই অপুট। আমাদের ঠাকুরদেবতা সব দেখ না, জগন্নাথেই মালুম!! বড্ড জোর ওদের (ইওরোপীয়দের)। নকল করে একটা আধটা রবিবর্মা দাঁড়ায়!! তাদের চেয়ে দিশী চালচিত্রি-করা পোটো ভাল—তাদের কাজে তবু ঝকঝকে রঙ আছে। ওসব রবিবর্মা-ফর্মা চিত্রি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়!! বরং জয়পুরে সোনালী চিত্রি, আর দুর্গাঠাকুরের চালচিত্রি প্রভৃতি আছে ভাল। ইওরোপী ভাস্কর্য চিত্র প্রভৃতির কথা বারান্তরে উদাহরণ সহিত বলবার রইল। সে এক প্রকাণ্ড বিষয়।